গীতা-বোধ

[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য]

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

ও

শ্রীকুমারচন্দ্র জানা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী

৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল করকমলে

নিবেদন

আমেদনগর ফোর্টে বন্দী থাকা সময় ১৯৪৪ সালে গুজরাটী শিখতে আরম্ভ করি। দুঃখের বিষয় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ন্যায় কৃতী শিক্ষক লাভের সৌভাগ্য হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষারম্ভের কিছুদিন পরেই শরীর অসুস্থ হওয়ায় গুজরাটী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করতে পারিনি। সে সময় গান্ধীজী লিখিত 'গীতাবোধ' সর্দ্দারজীর কাছে পড়ি। বইখানা আমার এত ভাল লাগে যে তখনি বাংলা অনুবাদ করতে ইচ্ছা হয়। শরীর বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে যায়। মুক্তির পরও অনেকদিন এ কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র জানা জেল হতে মুক্তি লাভ করে দেখা করতে আসেন এবং তাঁর বাংলায় অনূদিত 'গীতাবোধ'খানা দেখে দিতে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, কিন্তু কুমার বাবুর অনুবাদ হিন্দী অনুবাদ হতে করা বলে জনসাধারণের হাতে দিতে একটু দ্বিধা বোধ হয়। এ কথা কুমার বাবুকে নিঃসঙ্কোচে বলি। তিনি আমার এ মত যুক্তিযুক্ত মনে করেন, কিন্তু এরূপ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ হওয়া

অত্যাবশ্যক এ কথার উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁরই বিশেষ আগ্রহে নানা কাজের মধ্যেও মূল গুজরাটী হতে অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করি। কুমার বাবুর অনুবাদ হতেও খানিকটা সাহায্য পেয়েছি—তাই পুস্তকখানা যুক্ত নামে প্রকাশ করা সমীচীন বলেই মনে হয়।

স্নেহভাজন শ্রীমান কান্তি মেহতা বইখানি আগাগোড়া দেখে ভুল ত্রুটী সংশোধনে সাহায্য করেছে। তার এই সাহায্য না পেলে পুস্তকখানি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করতে সাহসী হতাম না।

গান্ধীজীর গুজরাটী সরল, সহজ ও প্রাঞ্জল। জানি না, এ অনুবাদে সে বৈশিষ্ট্য কতটা রক্ষা করতে পেরেছি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

ভূমিকা

আশ্রমে প্রতিপালিত ব্রত, যজ্ঞ ও যজ্ঞের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করেছি।* এখন যে পুস্তক আমি রোজ অল্প অল্প করে পড়ে প্রতি পনর দিনে একবার পাঠ সমাপ্ত করি, মনন বা বিশেষভাবে চিন্তা করি, যাকে আমার অধ্যাত্মিক দীপস্তম্ভ বা ধ্রুবতারা করে রেখেছি, তাকে আমি যেভাবে বুঝেছি, সেইভাবে আলোচনা করতে চাই। পূর্ব্বে প্রাপ্ত এক পত্র হতে আমার এ ইচ্ছা প্রথম হয়েছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে·······ভাইয়ের পত্র পেয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছি। উনি লিখেছেন যে 'অনাসক্তিযোগ' পড়ছেন কিন্তু বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছে। সবাই বুঝতে পারে এমন ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অক্ষরশঃ অনুবাদ করার দরুণ বুঝতে কষ্ট ত হবেই। আর বিষয়বস্তু যেখানে কঠিন সেখানে সহজভাষা কি করতে পারে? কাজেই এখন বিষয়বস্তুই সহজভাবে বুঝাবার চেষ্টা করা স্থির করেছি। যে জিনিষকে আমার সকল কাজে লাগাতে চাই, যার সাহায্যে আমার অন্তরের সকল গ্রন্থি ছিন্ন করবার প্রচেষ্টা করছি, সেই পুস্তক যত প্রকারে এবং যেভাবে বোধগম্য হয় সেই

* এই পত্রসমূহ 'মঙ্গল প্রভাত' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ভাবে যদি আমি উহাকে বুঝতে পারি এবং পুনঃপুনঃ উহাকে মনন করি, তা হলে অবশেষে আমি নিশ্চয় তদ্গতচিত্ত হতে পারব। আমি ত আমার সকল অসুবিধায় সময় মাতৃস্বরূপা গীতার নিকট ছুটে যাই এবং আজ পর্য্যন্ত তার কাছে আশ্বাসবাণী বা সান্ত্বনাও পেয়েছি। এজন্য যেভাবে আমি দিনের পর দিন গীতাকে বুঝছি, সান্ত্বনাকামী অন্য ব্যক্তি তা জানলে হয়ত তার যথেষ্ট সহায়তা মিলতে পারে এবং এর থেকে তিনি কিছু নূতন আলোকের সন্ধান পেতে পারেন তাও অসম্ভব নয়।

তাঃ ৪.১১.৩০

যারবাদা জেল

প্রস্তাবনা

গীতা মহাভারতের এক ছোট অংশ। মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে ধরা হয়, কিন্তু আমার মতে মহাভারত ও রামায়ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়—ধর্ম্মগ্রন্থ। যদি উহাদিগকে ইতিহাসই বলতে হয় তবে উহারা আত্মার ইতিহাস। অর্থাৎ হাজার হাজার বৎসর পুর্ব্বে কি ঘটেছিল তার বিবরণ এদের ভিতরে নেই, কিন্তু আছে আজ প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে সব ঘটনা ঘটছে তার আদ্যন্ত বর্ণনা। দেব ও দানব—রাম ও রাবণের ভিতর প্রতিদিন যে সংগ্রাম চলছে, মহাভারত ও রামায়ণে তারই বর্ণনা রয়েছে। ইহার মধ্যে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদই গীতা। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় এই সংবাদ বর্ণনা করেছেন। গীতা মানে যা গীত হয়েছে। এতে উপনিষদের সার রয়েছে। কাজেই এর সম্পূর্ণ মানে গীত উপনিষদ। উপনিষদ অর্থ জ্ঞান—বোধ। অতএব গীতার অর্থ, কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জ্জুনকে প্রদত্ত বোধ বা জ্ঞান—এই এসে দাঁড়ায়। আমাদের এই বুঝে গীতা পাঠ করা উচিত যে আমাদের হৃদয়ে আজও অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বিরাজিত, আর ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হলে অর্জ্জুনের মত জিজ্ঞাসু হয়ে যখনই অন্তর্যামী ভগবানকে

প্রশ্ন করা যায়, তার শরণাগত হওয়া যায়, তখনই তিনি আমাদিগকে জ্ঞানদানের জন্য প্রস্তুত। আমরা ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু অন্তর্যামী ত সদা জাগ্রত। আমাদের অন্তরে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হোক, তিনি ত এ আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু আমাদের ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আসেই না, এমন কি জিজ্ঞাসা করবার মত মনোভাবও হয় না। তাই রোজ গীতার মত পুস্তকের ধ্যান করি, তাকে মনন করতে করতে নিজের ভিতরে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করতে চাই, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শিক্ষা করতে চাই। আর যখনই কোন সঙ্কটে পড়ি তখনই সঙ্কট হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য গীতার নিকট ছুটে যাই এবং তার কাছে সান্ত্বনা লই। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমাদের গীতা পাঠ করা উচিত। গীতা আমাদের সদ্‌গুরু ও মাতৃ-স্বরূপা। আমাদের এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে তার কোলে মাথা রেখে সুখে শান্তিতে থাকতে পারব—গীতা হতেই আমাদের সকল ধর্ম্মসমস্যার মীমাংসা করতে পারব। এ ভাবে যিনি রোজ গীতাকে মনন করবেন তিনি তা থেকে নিত্য নূতন আনন্দ ও নূতন অর্থ পাবেন। এমন কোন ধর্ম্ম-সমস্যা নেই যার সমাধান গীতা করতে পারে না। আমাদের স্বল্প শ্রদ্ধার জন্য যদি গীতা না পড়ি ও বুঝি সে ভিন্ন কথা। তাই গীতার পারায়ণ করি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

একবার পাঠ সমাপ্ত করি যেন নিজের শ্রদ্ধা রোজ রোজ বেড়ে যায় এবং সতর্ক থাকি। এই ভাবে গীতাকে মনন করতে করতে যে অর্থ পেয়েছি এবং আজও পাচ্ছি, আশ্রম-বাসীদের সুবিধার জন্য তার সারভাগ এখানে দিচ্ছি।

তাঃ ১১.১১.৩০

যারবাদা জেল

গীতাবোধ

প্রথম অধ্যায়

তাঃ ১১.১১.৩০
মঙ্গল প্রভাত

যখন পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন, তখন কৌরবরাজ দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধার বর্ণনা করেন। যুদ্ধের সাজসজ্জা সব হয়ে গেলে উভয় পক্ষের শঙ্খ বেজে উঠল এবং অর্জ্জুনের সারথী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ উভয় সেনাদলের মধ্যে নিয়ে গেলেন। এ দেখে অর্জ্জুন ঘাবড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন "এদের সাথে আমি কি ভাবে যুদ্ধ করব? পর ব্যক্তিদের সাথে লড়াই করতে হত ত আমি এখনই লড়াই করতাম, কিন্তু এরা ত স্বজন—আমারই। কৌরব কারা আর পাণ্ডব কারা? তারা ত খুড়তাত জ্যেষ্ঠতাত ভাই। আমরা ত একসাথে বড় হয়েছি। দ্রোণ ত শুধু কৌরবদেরই আচার্য্য নন। তিনিই আমাদিগকেও সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। ভীষ্ম ত

আমাদের সকলেরই পূজনীয়। তাঁর সাথে আবার যুদ্ধ কি! এ কথা সত্য যে কৌরবগণ আততায়ী। তারা অনেক দুষ্কার্য্য করেছে, অন্যায় করেছে, পাণ্ডবদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে, দ্রৌপদীর ন্যায় মহাসতীর অপমান করেছে। এসব অবশ্যই এদের দোষ, কিন্তু এদের মেরে আমি কোথায় যাব? এরা ত মূঢ়, এদের মত আমি কেন হব? আমার ত কিছু জ্ঞান আছে, ভালমন্দ বিবেক আছে। কাজেই আমার ত জানা উচিত জ্ঞাতিদের সাথে যুদ্ধ করা পাপ। তারা পাণ্ডবদের সম্পত্তির অংশ কেড়ে নিয়েছে সত্য, তারা আমাদিগকে মেরে ফেলতেও পারে কিন্তু আমরা তাদের উপর কি ভাবে হাত তুলব? হে কৃষ্ণ, আমি ত আত্মীয় স্বজনদের সাথে যুদ্ধ করব না।" এই বলে অর্জ্জুন অবশ হয়ে রথে পড়ে গেলেন।

এই ভাবে প্রথম অধ্যায় শেষ। তার নাম 'অর্জ্জুন বিষাদযোগ।' বিষাদ অর্থ দুঃখ। যে দুঃখ অর্জ্জুনের হয়েছিল তা আমাদের সকলের হওয়া উচিত। ধর্ম্মবেদনা ও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ভিন্ন জ্ঞান মিলে না। যার মনে ভাল কি, মন্দ কি, এ জানবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত হয় না তার কাছে ধর্ম্মকথার মূল্য কি? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ত নিমিত্ত মাত্র, অথবা আমাদের শরীরই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র। ইহা কুরুক্ষেত্রও বটে আবার

ধর্ম্মক্ষেত্রও বটে। যদি আমরা শরীরকে ঈশ্বরের নিবাস-স্থান বলে মানি ও কার্য্যতঃ করি, তা হলে তা অবশ্যই ধর্ম্মক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সামনে প্রতিদিন কোন না কোন লড়াই চলছে। এর অধিকাংশ লড়াই ইহা আমার এবং উহা তোমার—এ হতেই হয়। স্বজন ও পরজন এ ভেদ হতেই এই যুদ্ধ হয়। এই জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে বলতে যাচ্ছেন যে অধর্ম্মমাত্রের মূল রাগদ্বেষ। ইহা আমার—এই ভাব হতেই রাগ (আসক্তি) উৎপন্ন হয়, ইহা অন্যের—এই ভাব হতেই দ্বেষ উৎপন্ন হয়, বৈরভাব জন্মে। তাই গীতা ও অন্যান্য সকল ধর্ম্মগ্রন্থ তারস্বরে বলছে আমার তোমার ভেদ ভুলে যাওয়া উচিত অর্থাৎ রাগদ্বেষ ছাড়া উচিত। এরূপ বলা এক কথা কিন্তু কার্য্যতঃ এরূপ করা অন্য কথা। গীতা আমাদিগকে ইহা কার্য্যতঃ করার শিক্ষা দিচ্ছে। তা কি ভাবে সে কথাই আমরা বুঝতে চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাঃ ১৭.১১.৩০
সোমপ্রভাত

অর্জ্জুন কতকটা সুস্থ হলে পর ভগবান তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন "তোমার এরূপ মোহ কি করে হল ? তোমার মত বীরপুরুষের এ সাজে না।" কিন্তু অর্জ্জুনের মোহ এত সহজে দূর হওয়ার নয়। যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে বললেন— এ সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনদিগকে মেরে রাজত্ব দূরের কথা আমি স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত চাই না। আমি ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় ধর্ম্ম কি তার কোন ঠিকানা পাচ্ছি না। আপনার শরণ নিচ্ছি, আমাকে ধর্ম্ম কি বুঝান।

অর্জ্জুনকে এভাবে খুব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও জিজ্ঞাসু দেখে ভগবানের দয়া হল এবং তিনি তাকে বুঝাতে লাগলেন "তুমি নিরর্থক দুঃখিত হচ্ছ, আর না বুঝে জ্ঞানের কথা বলছ, মনে হয় তুমি দেহ ও দেহের ভিতরে অবস্থিত আত্মা এই দুইয়ের ভেদই ভুলে গিয়েছ। দেহ মরে আত্মা মরে না। দেহ ত জন্ম হতেই নশ্বর, দেহে যেমন যৌবন ও জরা আসে

তেমনি তার নাশও হয়। দেহের নাশ হলেও দেহীর নাশ হয় না। দেহের জন্ম আছে, আত্মার জন্ম নেই। আত্মা জন্মজরা রহিত, তার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। সে ত সদা বিদ্যমান। আজ আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। অতএব তুমি কার জন্য শোক করছ? তোমার মোহই তোমার শোকের কারণ। এই কৌরবদিগকে তুমি তোমার বলে মনে করছ, তাই তোমার মমতা হয়েছে; কিন্তু তুমি মনে রেখো, যে দেহের জন্য তোমার মমতা তার নাশ ত হবেই। কিন্তু যদি সেই দেহে অবস্থিত আত্মার বিচার কর তবে শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে তার নাশ করতে কেউ সমর্থ নয়। আগুন তাকে জ্বালাতে পারে না, জল তাকে ডুবাতে পারে না, বায়ু তাকে শুকাতে পারে না। আচ্ছা তুমি তোমার ধর্ম্মের বিচার করে দেখ। তুমি ত ক্ষত্রিয়। তোমার পিছনে এসব সৈন্য একত্রিত হয়েছে। এখন তুমি যদি ভীরু হও তবে তুমি যা চাও তার বিপরীত ফল হবে এবং তুমি হাস্যাস্পদ হবে। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে বীরপুরুষদের মধ্যে একজন বলে গণনা করা হয়। এখন যদি তুমি মাঝপথে লড়াই ছেড়ে দাও তবে তুমি ভীরুতা বশতঃ পালিয়েছ এরূপ বলবে। যদি পালান ধর্ম্ম হয় তবে লোকনিন্দাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে পালালে তোমার অধর্ম্মও হবে, তুমি লোকনিন্দার যোগ্য

বলেও গণ্য হবে—এই দুই প্রকারের দোষই তোমাতে বর্ত্তাবে।

এ পর্য্যন্ত আমি তোমার সাথে বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তি বিচার করেছি। আত্মা ও দেহের ভেদ বুঝিয়েছি এবং তোমার কুলধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাকে সচেতন করেছি। এখন তোমাকে কর্ম্মযোগের কথা বুঝাব। এ যোগ অনুসরণকারীদের লোকসান হয়ই না। এর মধ্যে তর্কের স্থান নেই, এতে ত আছে আচরণ এবং কাজ করে অনুভূতি লাভের কথা। আর হাজার মণ তর্ক অপেক্ষা এক রতি প্রমাণ আচরণ শ্রেষ্ঠ—ইহা ত সর্ব্বজনমান্য অনুভূতি। এই আচরণের মধ্যে যদি ভালমন্দ পরিণামের তর্ক আসে তবে তা দূষিত হয়ে যায়। পরিণাম বা ফলের বিচার করতে গেলেই বুদ্ধি মলিন হয়। পড়ুয়া মানুষ কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে নানাপ্রকার ফললাভের জন্য অনেক ক্রিয়াকর্ম্ম আরম্ভ করে বসে। এক ক্রিয়া হতে ফল না পেলে দ্বিতীয় ক্রিয়া করতে ছুটে যায়। আবার যদি কেউ তৃতীয় ক্রিয়ার কথা বলে ত তা করতে চেষ্টা করে এবং এমনি করতে করতে তার মতি-বিভ্রম ঘটে। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের ধর্ম্ম হচ্ছে ফলের বিচার না করে কর্ত্তব্য কার্য্য করে যাওয়া। এখন এই যুদ্ধ তোমার কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্য পালন করা তোমার ধর্ম্ম। লাভ লোকসান,

হারজিত তোমার হাতে নেই। গাড়ীর নীচের কুকুরের মত তুমি কেন ভার তোমার উপর এরূপ মনে করছ? * হারজিত, শীতগ্রীষ্ম, সুখদুঃখ এসব দেহের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এসব মানুষের সহ্য করা উচিত। পরিণাম যাই হোক সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকে, সমতা রেখে মানুষের নিজের কর্ত্তব্যে তন্ময় হয়ে যাওয়া উচিত। এরই নাম যোগ, এর ভিতরেই রয়েছে কর্ম্মকুশলতা। কার্য্যের সিদ্ধি কার্য্য করার ভিতরেই রয়েছে, তার ফলে নয়। প্রকৃতিস্থ হও, ফলের অভিমান ছাড়, কর্ত্তব্য পালন কর।" এ শুনে অর্জ্জুন বললেন 'এসব ত আমার শক্তির অতীত বলে মনে হচ্ছে। হারজিতের বিচার ছাড়া, পরিণামের বিচার না করা--এরূপ সমতা, এরূপ

* কাঠিওয়ারে গ্রীষ্মকালে ছায়া পাওয়ার জন্য কুকুর গরুর গাড়ীর নীচে যেয়ে গাড়ীর সাথে সাথে চলে। সেই কুকুর যদি মনে করে সে গাড়ীর ভার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তবে সেটা অজ্ঞানতা। মানুষ যদি মনে করে সে-ই কর্ম্মফলের কর্ত্তা তবে সেই ভাবনাও উপরোক্ত কুকুরের ভাবনার মতই অজ্ঞানতা। প্রসিদ্ধ গুজরাটি কবি নরসিংহ মেহতা তাঁর কবিতায় এই ভাবকে অমর রূপ দিয়ে গিয়েছেন :—

"হুঁ করু হুঁ করু এ জ অজ্ঞানতা ,
শকটনোভার জেম শ্বানতানে।"

আমি করি আমি করি এ-ই অজ্ঞানতা। গাড়ীর ভার যেমন কুকুর বহন করে।

স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন লোক কি প্রকারের হয় এবং তাকে কিভাবে চিনতে পারা যায়—এসব আমাকে বুঝিয়ে বলুন।'

তখন ভগবান জবাব দিলেন—হে রাজা! যে মানুষ নিজের কামনা মাত্র ত্যাগ করেছে এবং নিজের অন্তর হতেই সন্তোষ বা আনন্দলাভ করে তাকে স্থিরচিত্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি বা সমাধিস্থ বলা হয়। এরূপ মানুষ দুঃখে দুঃখিত বা সুখে উৎফুল্ল হয় না। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। তাই এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কচ্ছপের ন্যায় নিজের ইন্দ্রিয় গুটিয়ে নেন। শত্রু দেখলেই কচ্ছপ তার নিজের অঙ্গ ঢালের (নিজের শরীরের শক্ত ঢাল সদৃশ আবরণের) নীচে গুটিয়ে নেয়। যখন বিষয়সমূহ মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপর চড়াও করার জন্য দাঁড়িয়েই আছে, তখন তার ত উচিত সদাসর্ব্বদা ইন্দ্রিয়কে গুটিয়ে রেখে নিজে ঢাল স্বরূপ হয়ে বিষয়ের সঙ্গে লড়াই করা। এ-ই প্রকৃত যুদ্ধ। বিষয় হতে দূরে থাকবার জন্য কেহ কেহ ত দেহ দমন করে, উপবাস করে। এ ঠিক। উপবাস থাকা পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় না, কিন্তু শুধু উপবাসের দ্বারা রস (বিষয়ে আসক্তি) শুকিয়ে যায় না। উপবাস ত্যাগ করলে রস আরও বেড়ে যায়। রস বা আসক্তি দূর করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই। ইন্দ্রিয় এমন বলবান যে মানুষ

যদি সাবধান না থাকে, তবে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। তাই মানুষের উচিত সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের বশে রাখা। কিন্তু তা ত তখনই সম্ভবপর যখন মানুষ ঈশ্বরের ধ্যান করে, অন্তর্মুখী হয়, হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামীকে চিনে, তাকে ভক্তি করে। এমন যে মানুষ মৎপরায়ণ হয়েও থেকে আপন ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে রাখে, তাকে স্থির-বুদ্ধি যোগী বলা হয়। এরূপ যে করে না, তার অবস্থা কিরূপ হয় তাও বলছি। যার ইন্দ্রিয়গণ স্বেচ্ছাচারী হয়, সে নিত্য বিষয় চিন্তায় রত থাকে। ফলে বিষয়ের সাথে তার নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তা ছাড়া অন্য কিছু তার নজরেই আসে না। এই সংযোগের ফলে তার ভিতরে কাম উৎপন্ন হয়, এবং তা পূর্ণ না হওয়ার দরুণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধাতুর ব্যক্তি আধা পাগল ত হয়ই, তার নিজের বিবেক থাকে না, স্মরণ না থাকার দরুণ যা তা বকে এবং আচরণ করে। এরূপ মানুষের পরিণাম নাশ ভিন্ন আর কি হতে পারে? যার ইন্দ্রিয়সমূহ এরূপ ভাবে বিচরণ করে তার অবস্থা হালবিহীন নৌকার মত হয়। যেমন তেমন হাওয়াও এরূপ নৌকাকে যেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যায়, অবশেষে কোন চড়ার উপর ধাক্কা খেয়ে নৌকা চূরমার হয়ে যায়। যার ইন্দ্রিয় যদৃচ্ছ বিচরণ করে,

তার অবস্থাও ঐরূপ হয়। তাই মানুষের উচিত কামনা ত্যাগ করা ও ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে রাখা। এর অর্থ এই যে ইন্দ্রিয় কোন অনুচিত কাজ করবে না, চোখ সোজা থাকবে, শুধু পবিত্র বস্তুই দেখবে, কান ভগবৎভজন বা দুঃখীর আর্ত্তনাদ শুনবে, হাত পা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকবে অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মানুষের কর্ত্তব্যকার্য্যে নিয়োজিত থাকবে এবং তা হতে ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ হবে। ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ হলে সমস্ত দুঃখের অবসান হল এ কথা জেনো। সূর্য্য কিরণে যেমন বরফ গলে যায়, তেমনি ঈশ্বর অনুগ্রহে সমস্ত দুঃখ দূর হয়। যিনি ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ করেছেন তাকে স্থিরবুদ্ধি বলা যায়। যার বুদ্ধি স্থির নেই তার উত্তম ভাবনা কোথা হতে আসবে? যার উত্তম ভাবনা নেই তার শান্তি কোথা হতে আসবে? যেখানে শান্তি নেই সেখানে সুখ কোথা হতে আসবে? যেখানে স্থিরবুদ্ধি মানুষ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট দেখতে পায় অস্থিরমতি লোক সংসারের ঝঞ্জাটে পড়ে দেখতেই সমর্থ হয় না। আর এই সংসারের আবর্ত্তে যা স্বচ্ছ বলে মনে হয়, সমাধিস্থ যোগী তা স্পষ্টভাবে মলিন বলে দেখে, বাস্তবিক সেদিকে নজরও দেয় না। প্রবহমান নদীনালার জল যেমন সমুদ্রে পতিত হয়ে শান্ত হয়ে যায়, বিষয়সমূহও এই সমুদ্ররূপ যোগীর ভিতরে শান্ত হয়ে যায়—সমাধিস্থ যোগীর অবস্থা

এরূপই। এরূপ মানুষ সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্বদা শান্ত থাকে। তাই যে মানুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করে, নিরহঙ্কার হয়ে, মমতা ছেড়ে, প্রশান্ত ভাবে আচরণ করেন, তিনি শান্তি পান। ইহা ঈশ্বর প্রাপ্তির অবস্থা এবং এই অবস্থা যাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে তিনি মোক্ষলাভ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

তাঃ ২৪.১১.৩০
সোমপ্রভাত

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শুনে অর্জ্জুনের এরূপ ধারণা হল যে মানুষের স্থির হয়ে বসে থাকাই উচিত। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের মধ্যে কর্ম্মের নাম পর্য্যন্তও তিনি (অর্জ্জুন) শুনেন নি। তাই ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি যা বলছেন তা হতে মনে হয় কর্ম্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই আমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটছে। যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমাকে ঘোর কর্ম্মে কেন লিপ্ত করছেন? আমাকে স্পষ্ট বলুন কিসে আমার ভাল।'

তখন ভগবান উত্তর দিলেন :—'হে পাপরহিত অর্জ্জুন, সুরু হতেই এ জগতে দুইটি পথ চলে আসছে, একটিতে জ্ঞানের এবং অপরটীতে কর্ম্মের প্রধান স্থান। কিন্তু তুমিও দেখতে পাবে যে কর্ম্ম বিনা মানুষ অকর্ম্মী হতে পারে না। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান আসেই না। কোন মানুষ সব কাজ ছেড়ে বসে গিয়েছে, কাজেই সে সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গিয়েছে—এরূপ বলা চলে না। তুমি ত দেখছ যে প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন কাজ করছেই। তার স্বভাবই তাকে কিছু না কিছু করাবে। জগতের এরূপ নিয়ম সত্ত্বেও যে মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে এবং মনে মনে অনেক প্রকারের আকাশকুসুম রচনা করে সে মূর্খ পর্য্যায়ভুক্ত এবং মিথ্যাচারী বলে গণ্য হয়। তার চেয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রেখে, রাগদ্বেষ রহিত হয়ে, হৈচৈ না করে ও আসক্তিহীন হয়ে অর্থাৎ অনাসক্ত থেকে হাত পা দ্বারা? কোন না কোন কর্ম্ম করা, কর্ম্মযোগ আচরণ করা কি ভাল নয় নিয়তকর্ম্ম অর্থাৎ তোমার ভাগে যে সেবাকার্য্য এসে পড়ে, ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে রেখে তুমি তাই করে যাও। অলসের মত বসে থাকার চেয়ে এ ভালই। যে অলস হয়ে বসে থাকে অবশেষে তার শরীরও ভেঙ্গে যায়। কিন্তু কর্ম্ম করার সময় ইহা মনে রেখো যে যজ্ঞকার্য্য ভিন্ন সমস্ত কার্য্যই মানুষকে বন্ধনের মধ্যে রাখে। যজ্ঞ মানে নিজের জন্য নহে, কিন্তু অন্যের জন্য,

পরোপকারের নিমিত্ত কৃতশ্রম অর্থাৎ সংক্ষেপে সেবা। যেখানে সেবার জন্যই সেবা করা হয়, সেখানে আসক্তি বা রাগদ্বেষ হয় না। তুমি এরূপ যজ্ঞ ও সেবা করে যাও। ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করার সাথে সাথে যজ্ঞও সৃষ্টি করেছেন। জানিনা কি ভাবে এই মন্ত্র আমাদের কানে দিয়েছেন 'পৃথিবীতে যাও, একে অন্যের সেবা কর এবং বৃদ্ধি পাও, জীবমাত্রকে দেবতারূপ জ্ঞান কর, এই সব দেবতাকে (জীবকে) সেবা করে তাদিগকে প্রসন্ন রাখ, তারাও তোমাকে প্রসন্ন রাখবে। প্রসন্ন দেবতাগণ না চাইতেই মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করবে।' অতএব এরূপ বুঝা উচিত, যে লোকসেবা না করে, তাদের অংশ তাদিগকে প্রথম না দিয়ে খায় সে চোর। আর যে প্রত্যেক জীবের প্রাপ্য তাকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর খায় বা কোন জিনিষ ভোগ করে, তার ভোগ করবার অধিকার আছে, সুতরাং সে পাপমুক্ত। এর উল্টা অর্থাৎ যে শুধু নিজের জন্য উপার্জ্জন করে, পরিশ্রম করে, সে পাপী এবং পাপান্ন গ্রহণ করে। সৃষ্টির নিয়মই এই যে, অন্ন দ্বারাই জীব প্রতিপালিত হয়, বৃষ্টি হতে অন্ন জন্মে এবং যজ্ঞ হতে অর্থাৎ জীবমাত্রের পরিশ্রম হতে বৃষ্টির উৎপত্তি। যেখানে জীব নেই সেখানে বৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায় না, যেখানে জীব রয়েছে সেখানে বৃষ্টি আছেই। জীবমাত্রই শ্রমজীবি। শুয়ে শুয়ে থেকে

কেউ খেতে পায় না। মূঢ় জীবের বেলায় যদি এ সত্য, তবে মানুষের বেলায় তার চেয়ে কত বেশী খাটে? তাই ভগবান বলছেন ঃ—'ব্রহ্মা কর্ম্ম উৎপন্ন করেছেন, আবার ব্রহ্মার উৎপত্তি অক্ষর ব্রহ্ম হতে। অতএব এরূপ জেনো যে যজ্ঞ মাত্রেই—সেবামাত্রেই অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর বিরাজিত রয়েছে। যে মানুষ এই চক্রের অনুসরণ করে না, সে পাপী এবং নিরর্থক জীবন ধারণ করে।

(মঙ্গলপ্রভাত)

যে অন্তরে শান্তি ভোগ করে এবং সন্তুষ্ট থাকে, তার কিছু করবার নেই এরূপ বলতে পারা যায়। কর্ম্ম করলেও তার কোন লাভ নেই, না করলেও নেই। কারও সম্বন্ধে তার কোন স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও সে যজ্ঞকার্য্য ছাড়তে পারে না। তাই তুমি সদাসর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতে থাক, কিন্তু তাতে রাগদ্বেষ বা আসক্তি রেখো না। যে অনাসক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম করে সে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করে। আচ্ছা দেখ, জনকের ন্যায় নিস্পৃহ রাজা কিন্তু কর্ম্ম করতে করতে সিদ্ধিলাভ করেন, কারণ তিনি লোকহিতের জন্যই কাজ করতেন। তাহলে তোমার দ্বারা কি ভাবে তার উল্টা আচরণ হতে পারে! নিয়মই এই যে শ্রেষ্ঠ ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোক তার অনুকরণ

করে। আমাকে দেখ, কাজ করে কি আমার কোন স্বার্থ সাধন হয়? তথাপি আমি চব্বিশঘণ্টা বিরামহীন কাজে লেগেই আছি এবং তাই জনসাধারণও সেইমত কম ও বেশী পরিমাণ কাজ করে। কিন্তু আমি যদি অলস হই তবে জগতের কি অবস্থা হয়? যদি সূর্য্য চন্দ্রতারা প্রভৃতি স্থির হয়ে যায় তবে জগতের নাশ হয়, এ ত তুমি বুঝতে পার। এ সকলকে গতি দেওয়ার, নিয়মানুগ রাখবার জন্য ত আমিই রয়েছি না? কিন্তু জনসাধারণও আমার মধ্যে এই তফাৎ অবশ্য রয়েছে যে আমার আসক্তি নেই, তারা আসক্ত এবং স্বার্থের বশ হয়ে মজুরী করে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান জ্ঞানী যদি কর্ম্মত্যাগ করে তবে জনসাধারণও সেইরূপ করবে এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে। তোমার ত আসক্তি ছেড়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যাওয়া উচিত যেন জনসাধারণ কর্ম্মভ্রষ্ট না হয় এবং আস্তে আস্তে অনাসক্ত হতে শিখে। মানুষের স্বভাবে যে গুণ রয়েছে তার বশীভূত হয়ে তাকে কাজত করতেই হবে। মূর্খ লোকই মনে করে 'আমি করছি'। শ্বাসগ্রহণ জীবমাত্রেরই প্রকৃতি বা স্বভাব। চোখের উপর কিছু বসলে স্বভাবের বশেই মানুষ চোখের পাতা নড়ায়। তখন সে বলেনা 'আমি শ্বাস নিচ্ছি', 'আমি চোখের পাতা নাড়ছি'। এরূপ সব কৃতকর্ম্মই স্বভাবের গুণানুসারে

কেন না ঘটে? এর জন্য অহংকার কিসের? আর এরূপ মমতাহীন সহজভাবে কাজ করবার শ্রেষ্ঠপথ হচ্ছে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করা এবং আমার নিমিত্ত মমতাত্যাগ করে করা। এরূপ করতে করতে যখন মানুষের অহংবৃত্তি ও স্বার্থ নাশ হয়, তখন তার কর্ম্মমাত্র স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষ হয়ে যায় এবং সে অনেক জঞ্জাল হতে মুক্ত হয়। শেষে তার কর্ম্মবন্ধন বলে কিছু থাকে না। আর যেখানে স্বভাবের বশে কর্ম্ম হয় সেখানে বলপূর্ব্বক তা না করবার দাবী করার মধ্যেই অহংকার রয়েছে। এরূপভাবে জোর করে স্বভাবের বিরুদ্ধে যারা কাজ হতে বিরত হয়, বাইরে থেকে তারা কাজ করছেন এরূপ মনে হলেও এদের মন অন্তরে মায়াজাল রচনা করেই। ইহা বাহ্য চেষ্টা হতেও খারাপ এবং সমধিক বন্ধনকারক।

আসল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি রাগদ্বেষ ত রয়েছেই। কান কোন একটা শুনতে পছন্দ করে আবার কোনটা অপছন্দ করে। নাক গোলাপ ফুলের সুঘ্রাণ নিতে ভালবাসে, মলাদির দুর্গন্ধ অপছন্দ করে। সব ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারই এরূপ জেনো। অতএব মানুষের যা কর্ত্তব্য তা হচ্ছে রাগদ্বেষরূপী দুইটী দস্যুর বশ না হওয়া। আর রাগদ্বেষ দূর করতে হয়ত কাজের ধাঁধায় ঘুরবে

না। আজ একাজ, কাল অন্য কাজ, পরশু তৃতীয় একটী—এরূপ বৃথা চেষ্টা করবে না। কিন্তু নিজের ভাগে যে সেবা কাজ আসে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য তা করতে তৎপর থেকো। এরূপ করলে যা করছ তা ঈশ্বরই করাচ্ছেন—এই ভাবনা উৎপন্ন হবে, এরূপ জ্ঞান জন্মাবে এবং অহংভাব চলে যাবে। এরই নাম স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম আঁকড়ে থেকো, কারণ নিজের জন্য এ-ই উত্তম। পরধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত ভাল বলে প্রতীত হলেও তাকে ভয়ানক বলে জেনো। স্বধর্ম্ম আচরণ করে মৃত্যু বরণ করলেও মোক্ষ হয়। রাগদ্বেষ রহিত হয়েই কর্ম্ম করা যায় এবং তা-ই যজ্ঞ।' ভগবান এরূপ বললে অর্জ্জুন প্রশ্ন করলেন—'মনুষ্য কার প্রেরণায় পাপ কর্ম্ম করে? অনেক সময় ত এরূপ মনে হয় যে কেউ তাকে জোর করে পাপ কর্ম্মের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

ভগবান বললেন—'মানুষকে পাপ কর্ম্মের দিকে টেনে নিয়ে যায় কাম ও ক্রোধ। এরা সহোদর ভাইয়ের মত। কাম পূর্ণ না হল ত ক্রোধ এসে উপস্থিত। যার ভিতরে কামক্রোধ আছে তাকে আমরা রজোগুণী বলি। এরাই মানুষের বড় শত্রু। তাদের সাথে রোজ যুদ্ধ হয়। আয়নার উপর ময়লা পড়লে যেমন তা অস্পষ্ট হয়ে যায়, আগুনে ধুঁয়া হলে যেমন তা ঠিক মত জ্বলে না, অথবা গর্ভ ঝল্লীতে

আবৃত থাকা পর্য্যন্ত যেমন দম বন্ধ থাকে, তেমনি কাম ক্রোধ জ্ঞানীর জ্ঞানকে প্রকাশ হতে দেয় না, মলিন করে এবং দম বন্ধ করে রাখে। এই কাম অগ্নির মতো ভীষণ এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সবকে নিজের বশ করে মানুষকে অধঃপতিত করে। অতএব তুমি ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রথমেই বশ করে লও, পরে মনকে জয় কর। এরূপ করতে করতে বুদ্ধিও তোমার বশ হবে। কারণ এই, যদিও ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি পর্য্যায়ক্রমে একে অন্যের চেয়ে উপরে, তথাপি এদের সকলের চেয়ে আত্মা অনেক বড়। মানুষের আত্মার অর্থাৎ নিজের শক্তির জ্ঞান নেই, তাই মেনে নেই যে ইন্দ্রিয় বশে থাকে না এবং বুদ্ধিও কাজ করে না। আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস হলে শীঘ্রই অন্য সব সহজ হয়ে যায়। যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে বশে রেখেছেন, কাম, ক্রোধ ও তাদের অসংখ্য সৈন্য তার কিছুই করতে পারে না।'

এই অধ্যায়কে আমি গীতা বুঝবার চাবিস্বরূপ বলেছি। এক কথায় তার সার হচ্ছে এই যে, জীবন সেবার জন্য, ভোগের জন্য নয়। তাই আমাদের জীবনকে যজ্ঞময় করে নেওয়া চাই। ইহা জানলেই সেরূপ হয়ে যাওয়া হয় না। কিন্তু এরূপ জেনে আচরণ করে আমাদিগকে উত্তরোত্তর শুদ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু সত্যিকারের সেবা কাকে বলা

হয়? এ জানবার জন্য ইন্দ্রিয় দমন করার আবশ্যকতা রয়েছে এবং এরূপ করতে করতে ক্রমশঃ আমরা সত্যরূপী পরমাত্মার নিকট এসে যাই। যুগে যুগে আমাদের নিকট সত্যের অধিকতর প্রকাশ হয়। সেবাকার্য্য যদি স্বার্থদৃষ্টি হতে হয় তবে তা যজ্ঞ থাকে না। কাজেই অনাসক্তির পরম আবশ্যকতা। এতটা জানার পর আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বাদ বিবাদের মধ্যে পড়তে হয় না। অর্জ্জুনকে কি সত্যই স্বজন মারবার জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল? তাতে কি ধর্ম্ম আছে? এরূপ প্রশ্ন উঠেই না। অনাসক্তি এলে কাউকে মারবার ছুরি হাতে থাকলেও তা সহজে হাত হতে পড়ে যায়। কিন্তু অনাসক্তির আড়ম্বর করলে তা আসে না। আমরা চেষ্টা করলে আজ আসতেও পারে, আবার হাজার বৎসর চেষ্টা সত্বেও না আসতে পারে। কিন্তু এ চিন্তাও ত্যাগ কর। চেষ্টার মধ্যেই সফলতা রয়েছে। চেষ্টা ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের তা অনুসন্ধান করা দরকার। দেখতে হবে এর মধ্যে কোন আত্মপ্রতারণা না থাকে। এতটা খেয়াল রাখা সকলের পক্ষেই সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

তাঃ ১.১২.৩০

সোমপ্রভাত

ভগবান অর্জ্জুনকে বলছেন আমি যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথা তোমাকে বললাম তা অতি প্রাচীনকাল হতেই চলে আসছে। এ কোন নূতন কথা নয়। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত এবং তুমি বর্ত্তমানে ধর্ম্মসঙ্কটে পড়েছ, তা হতে মুক্ত করবার জন্যই আমি তোমাকে এ শিক্ষা দিয়েছি। যখন যখনই ধর্ম্মের নিন্দা এবং অধর্ম্মের প্রভাব হয় তখন আমি অবতাররূপ গ্রহণ করি এবং ভক্তকে রক্ষা ও পাপীকে সংহার করি। আমার এই মায়া যে জানে সে এই বিশ্বাস রাখে যে, অধর্ম্মের লোপ হবেই, সাধুপুরুষদের রক্ষক ভগবান আছেনই। সে ধর্ম্মত্যাগ করে না এবং অবশেষে আমাকে লাভ করে। কারণ সে আমার ধ্যানে রত থাকার এবং আমার আশ্রয় নেওয়ার দরুণ কাম ক্রোধাদি হতে মুক্ত থাকে এবং তপ ও জ্ঞানের প্রভাবে শুদ্ধ অবস্থায় থাকে। মানুষ যেমন কাজ করে তেমন ফল

পায়। আমার নিয়মের বাইরে যেয়ে কেউ থাকতে পারে না। গুণ কর্ম্মের ভেদ অনুসারে আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি। তা সত্ত্বেও আমি এ সবের কর্ত্তা বলে মনে করো না। কারণ এ কার্য্য হতে আমার কোন ফলের অপেক্ষা নেই, এর পাপ পুণ্য আমাতে বর্ত্তায় না। এই ঐশ্বরিক মায়া বুঝবার যোগ্য। জগতে যে যে প্রবৃত্তি চলছে তা সমস্তই ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী, তথাপি ঈশ্বর তাতে অলিপ্ত। ঈশ্বর তার কর্ত্তাও বটে, অকর্ত্তাও বটে। এরূপ অলিপ্ত থেকে, অপবিত্র না হয়ে, ফলেচ্ছা না করে ঈশ্বর যেরূপ আচরণ করেন সেরূপ মানুষও যদি নিষ্কামভাবে আচরণ করে তবে অবশ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এরূপ মানুষ কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখে এবং কি কাজ করা উচিত নয় সে খবরও তার শীঘ্র মিলে। যাতে কামনা আছে, কামনা ভিন্ন যা হওয়াই সম্ভব নয়, সে সমস্তই অনুচিত কার্য্য বলা যায়—যেমন চুরি ব্যভিচার ইত্যাদি। এরূপ কর্ম্ম অলিপ্ত থেকে কেউ করতে পারে না। অতএব যে কামনা ও সংকল্প করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যায় সে নিজের জ্ঞানরূপী অগ্নির সাহায্যে নিজের কর্ম্ম জ্বালিয়ে ফেলেছে, একথা বলা চলে। এভাবে যিনি কর্ম্মফলের আসক্তি ছেড়েছেন তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও স্বাধীন। তাঁর মন স্থির থাকে, তিনি কোন প্রকারের সংগ্রহের মধ্যে

পড়েন না এবং সুস্থ নীরোগ পুরুষের শারীরিক ক্রিয়ার মত এরূপ মানুষের প্রবৃত্তিও স্বচ্ছন্দভাবে চলে। তিনি নিজে তা চালাচ্ছেন এরূপ অভিমান হয় না, এরূপ অনুভব পর্য্যন্ত হয় না। নিজে নিমিত্ত মাত্র হয়ে থাকেন। সফলতা মিলে তাতেই বা কি, আর নিষ্ফলতা মিলে তাতেই বা কি? তিনি সফলতায় উৎফুল্ল হন না ও নিষ্ফলতায় ঘাবড়ান না। তাঁর সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে, সেবার জন্য নিষ্পন্ন হয়। তিনি সকল কর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরকেই দেখেন এবং অবশেষে ঈশ্বরকেই লাভ করেন।

যজ্ঞত অনেক প্রকারের বর্ণনা করা হয়েছে। সে সকলের মূলে শুদ্ধি ও সেবা। ইন্দ্রিয় দমন এক প্রকারের যজ্ঞ। কাউকে দান করা অন্য প্রকারের। পবিত্রতা লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি সুরু করাও যজ্ঞ। এর জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞ গুরুর নিকট হতে পাওয়া যায়। সে প্রাপ্তি বিনয়, উৎসাহ ও সেবা দ্বারাই হতে পারে। সব না বুঝে যজ্ঞের নামে অনেক কাজ সুরু করলে অজ্ঞানতা প্রসূত হওয়ার জন্য ভালর বদলে খারাপও করে বসে। তাই প্রত্যেক কার্য্য জ্ঞান পূর্ব্বক হওয়ার পূর্ণ আবশ্যকতা রয়েছে।

এই জ্ঞান অক্ষরজ্ঞান নয়। এই জ্ঞানে সন্দেহের স্থানই নেই। শ্রদ্ধা হতে তার আরম্ভ এবং অবশেষে তা অনুভূত

হয়। এই জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সমস্ত জীবকে নিজের ভিতরে দেখে এবং নিজেকে ঈশ্বরে দেখে অর্থাৎ এ সমস্ত প্রত্যক্ষ ঈশ্বরময় বলে মনে হয়। এইজ্ঞান পাপীদের মধ্যেও যারা অধম তাদিগকেও ত্রাণ করে। এই জ্ঞান মানুষকে কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্ত করে অর্থাৎ কর্ম্মফল তাকে স্পর্শ করে না। এর মত পবিত্র এ্ জগতে আর কিছু নেই। অতএব তুমি শ্রদ্ধা রেখে, ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রেখে এই জ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টা কর, তা হতে তোমার পরম শান্তি মিলবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই তিন অধ্যায় এক সঙ্গে মনন করার যোগ্য। এই তিন অধ্যায়ে অনাসক্তিযোগ কি তার খবর রয়েছে। এ অনাসক্তি—নিষ্কামতা কিরূপে পাওয়া যায় তাও তাতে অল্পবিস্তর বলা হয়েছে। এই তিন অধ্যায় ভাল ভাবে বুঝে নিলে বাকী অধ্যায়-গুলি বুঝতে কম মুস্কিল হয়। পরের অধ্যায়সমূহ অনাসক্তি লাভ করবার সাধন অনেকভাবে আমাদিগকে বলছে। এই দৃষ্টিতে গীতার অভ্যাস আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং সেরূপ করতে করতে আমাদের প্রতিদিনকার সমস্যা বিনা পরিশ্রমে গীতার মারফৎ সমাধান করতে পারব। রোজ অভ্যাস দ্বারা এরূপ হওয়া সম্ভব। সবাই পরীক্ষা করে দেখতে পারে। ক্রোধ উপস্থিত হওয়ামাত্র তৎসম্বন্ধীয়

শ্লোক মনন কর, তা হলেই ক্রোধের উপশম হবে। কারো উপর দ্বেষ হয়, ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা হয়, ইহা করা উচিত কি অনুচিত এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয়—এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান মাতৃস্বরূপা গীতার নিকট পাওয়া যায় যদি শ্রদ্ধা থাকে আর নিত্য মনন করা যায়। যাতে এরূপ অভ্যাস হয়ে যায় তার জন্যই রোজকার পারায়ণ এবং তারি জন্য এই প্রচেষ্টা।

যজ্ঞ—১

তাং ২১.১০,৩০
মঙ্গল প্রভাত

আমরা যজ্ঞ শব্দের ব্যবহার অনেক পরিমাণে করি। আমরা রোজকার মহাযজ্ঞও রচনা করেছি। তাই যজ্ঞ শব্দের বিচার বা আলোচনা করা আবশ্যক। যজ্ঞ অর্থ ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রকারের প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না করে পরার্থে কৃত যে কোন কর্ম্ম। কর্ম্ম কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই তিন প্রকারের। কর্ম্মের ব্যাপকতম অর্থ

লও। পর অর্থ কেবল মানুষ নহে কিন্তু সমস্ত জীব। এইজন্য এবং অহিংসার দৃষ্টিতেও, মনুষ্য জাতির সেবার জন্যও অন্য জীবের হোম বা তার নাশ করা যজ্ঞের মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। বেদাদি গ্রন্থে ঘোড়া, গরু প্রভৃতি জন্তুর হোম করার কথা আছে, আমরা তাকে বাদ দিয়েছি। সত্য ও অহিংসার মানদণ্ডে পশুহিংসা অর্থে এই হোম হতে পারে না এতেই আমরা সন্তুষ্ট। ধর্ম্মের নামে পরিচিত বাক্যের ঐতিহাসিক অর্থ করতে আমরা সময় অতিবাহিত করি না এবং সেই অর্থ বের করার আমাদের অযোগ্যতা স্বীকার করি। সে যোগ্যতা লাভের চেষ্টাও আমরা করছি না, কারণ ঐতিহাসিক অর্থে জীবহিংসা মানলেও সত্য ও অহিংসাকে সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম মেনে নেওয়ার পর আমাদের পক্ষে সে অর্থানুযায়ী আচার ত্যজ্য।

উপরের ব্যাখ্যানুযায়ী বিচার করলে আমরা দেখতে পাই কি, যে কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জীবের সর্ব্বাধিকক্ষেত্রে কল্যাণ হয়, যে কর্ম্ম সব চেয়ে বেশী মানুষ সব চেয়ে বেশী সহজে করতে পারে, এবং যাতে সব চেয়ে বেশী সেবা হয় তা মহাযজ্ঞ অথবা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। অতএব কারো সেবার জন্য অন্য কারো অকল্যাণ ইচ্ছা বা সাধন করা যজ্ঞ কার্য্য নয়ই। আর ভগবদ্গীতা এবং অনুভব

আমাদিগকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে যজ্ঞ কার্য্য ছাড়া যা কিছু করা যায় তা বন্ধন স্বরূপ।

এই যজ্ঞ ছাড়া এ জগৎ এক মুহূর্ত্তও টিকতে পারে না। এবং তাই গীতাকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কতকটা আভাস দিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে তাকে লাভ করার উপায়ের কথা বলেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে আমরা জন্মের সাথেই যজ্ঞকে নিয়ে এসেছি অর্থাৎ এই দেহ কেবল পরমার্থের জন্যই আমরা পেয়েছি। অতএব যজ্ঞ না করে যে খায় সে চোরাই জিনিষ খাচ্ছে গীতাকার এরূপ শক্ত কথা বলেছেন। যারা শুদ্ধজীবন যাপন করতে চান তাদের সমস্ত কার্য্য যজ্ঞরূপ হয়। আমরা যজ্ঞের সাথে অবতীর্ণ হয়েছি এর মানে আমরা সর্ব্বদাই ঋণী-দেনাদার। তাই আমরা সর্ব্বদা জগতের গোলাম—সেবক। এবং প্রভু যেমন সেবা নেওয়ার জন্য গোলামকে অন্ন বস্ত্রাদি দেয় তেমনি যদি জগতের প্রভুও আমাদের কাছ থেকে সেবা নেওয়ার জন্য আমাদিগকে অন্ন বস্ত্র দেন তা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করা উচিত। ততটাও আমাদের ন্যায্য অধিকার এরূপ মনে করা উচিত নয় অর্থাৎ কিছু না পেলেও প্রভুর নিন্দা করব না। এই শরীর তাঁর, তাঁর ইচ্ছানুসারে তিনি রাখেন বা নাশ করেন। এ অবস্থা দুঃখজনক নয়, দয়ার যোগ্যও

নয়। যদি নিজের স্থান বুঝে নেও তবে এ স্বাভাবিক কাজেই সুখদ ও বাঞ্ছিত। এই পরম সুখ অনুভব করার জন্য অবিচল শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছেই। নিজের সম্বন্ধে চিন্তাই করো না, সমস্ত ভগবানকে সমর্পণ করে দেও। এরূপ উপদেশ আমি ত সকল ধর্ম্মেই দেখেছি।

কিন্তু এ বাক্য হতে কারো ভয় পাওয়ার কারণই নেই। মন স্বচ্ছ রেখে যে সেবা আরম্ভ করে তার কাছে তার আবশ্যকতা দিন প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তেমনি তেমনি তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। যে স্বার্থ ছাড়তে তৈরী-ই নয়, নিজের জন্মের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতেও তৈরী নয় তার পক্ষে ত সেবামার্গ মাত্রই কঠিন। তার সেবার ভিতরে স্বার্থের গন্ধ আসতে থাকবেই। কিন্তু এরূপ স্বার্থী জগতে কদাচিৎ দেখতে পাবে। কোন না কোন নিঃস্বার্থ-সেবা আমরা সবাই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসার করে থাকি। এ-ই জিনিষ যদি আমরা বিচারপূর্ব্বক করে যাই তবে আমাদের পারমার্থিক সেবা করবার বৃত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে, এবং তাতেই আমাদের প্রকৃত সুখ এবং জগতের কল্যাণ রয়েছে।

যজ্ঞ—২

তাং ২৮.১ .৩০

মঙ্গল প্রভাত

যজ্ঞ সম্বন্ধে গত সপ্তাহে লিখেছি কিন্তু আকাঙ্ক্ষা মিটেনি। জন্মের সাথে যে বস্তুকে নিয়ে এই জগতে এসেছি তার সম্বন্ধে একটু বেশী বিচার করা নিরর্থক নয়। যজ্ঞ নিত্য কর্ত্তব্য, চব্বিশ ঘণ্টা আচরণীয়বস্তু এরূপ বিচার করে এবং যজ্ঞ মানে সেবা এই জেনে 'পরোপকারের জন্যই সজ্জনদের শক্তি' এরূপ বাক্য যথোচিতভাবে অনুভব করি। নিষ্কাম সেবা পরোপকার নয় কিন্তু নিজেরই উপকার, যেমন কর্জ্জ শোধ করা পরোপকার নয় পরন্তু নিজেরই সেবা, নিজেরই উপকার, নিজের উপকার ভার লাঘব, নিজের ধর্ম্ম রক্ষা। আবার শুধু সজ্জনদেরই পুঁজি 'পরোপকারার্থে' ভাল ভাষায় সেবার জন্য এরূপ নয়, কিন্তু সকল মানুষের পুঁজিমাত্রই সেবার জন্য। এরূপ হয়ত সকলের জীবন হতেই ভোগের নাশ হয়ে যায় এবং তা ত্যাগময় হয় অথবা ত্যাগেই ভোগ বর্ত্তমান। মানুষের ত্যাগ 'এ-ই তার ভোগ। ইহাই পশু ও মানুষের মধ্যে প্রভেদ। জীবনের অর্থ এরূপ করলে জীবন শুষ্ক হয়ে যায়, কলার নাশ হয়

এবং গৃহস্থ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, এরূপ কথা অনেকে আরোপ করে এবং উপরোক্ত বিচারকে দোষযুক্ত বলে গণ্য করে। কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ বলার মধ্যে ত্যাগের কদর্থ রয়েছে। ত্যাগ মানে সংসার ছেড়ে অরণ্যে বাস করা নয়, কিন্তু জীবনের সমস্ত প্রবৃত্তির ভিতরে ত্যাগের ভাবনা হওয়া। গৃহস্থজীবন ত্যাগময়ও হয় ভোগময়ও হয়। মুচি জুতো সেলাই করে, কৃষক ক্ষেতী করে, নাপিত চুল কাটে, এর মধ্যে ত্যাগ ভাবনাও হয় অথবা ভোগ লালসাও হয়। যজ্ঞার্থে ব্যবসাকারী ক্রোড় টাকার ব্যবসা করলেও লোক সেবারই বিচার করবে,.সে কাউকে ঠকাবে না, ক্রোড়পতি হয়েও সাদাসিদে ভাবে থাকবে, ক্রোড় টাকা উপার্জ্জন করলেও কারো লোকসান করে না, কারো লোকসান হওয়ার সম্ভাবনায় হয়ত ক্রোড় টাকা যেতে দিবে। এরূপ বেপারী শুধু আমার কল্পনায় রয়েছে একথা বলে কেউ যেন হাসে না। জগতের সৌভাগ্য বশতঃ এরূপ বেপারী পশ্চিমে ও পূর্ব্বে রয়েছে। সত্য বটে তাদের সংখ্যা আঙ্গুলের ডগায় গণা যায়, কিন্তু যদি একটীও এরূপ লোক জীবিত থাকে তা হলে এরূপ বেপারী যে কল্পনামাত্র তা বলা চলে না। এরূপ দরজীকে আমরা বড়বানে *

* কাঠিওয়ারের একটি সহর

দেখেছি। এরূপ এক নাপিতকে ত আমি চিনি। এরূপ তাঁতিকে আমাদের মধ্যে কে না জানে? বিচার ও অনুসন্ধান করলে সমস্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্যে কেবল যজ্ঞার্থে জীবন অতিবাহিত করে এবং নিজের কাজকর্ম্ম করে যায় এমন মানুষ নজরে পড়বে। একথা ঠিক যে এরূপ যাজ্ঞিক নিজের কাজকর্ম্ম হতেই নিজের জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু সেই সব কাজ জীবিকা অর্জ্জনের জন্য করে না, জীবিকা অর্জ্জন তাদের পক্ষে কার্য্যের গৌণ ফল। মতিলাল পূর্ব্বেও দরজী ছিল এবং জ্ঞানলাভের পরও দরজী ছিল। তার চিন্তাধারা বদলে গেল অর্থাৎ তার কাজকর্ম্ম যজ্ঞরূপ হল, তার মধ্যে পবিত্রতা এসে কাজকর্ম্মে অন্য প্রকারে সুখের বিচার জন্মাল। তার জীবনে তখনই কলার প্রবেশ হল। যজ্ঞময় জীবন কলার পরাকাষ্ঠা—প্রকৃত রসই তাতে রয়েছে। কারণ এই যে তা হতে রসের নিত্য নূতন ঝরণা বেরোয়। মানুষ তা (সেই রস) পান করে শ্রান্ত হয় না, ঝরণা কখনো শুকায় না। বোঝা স্বরূপ মনে হয়ত তা যজ্ঞ নয়, ক্লেশ বোধ হয় ত তা ত্যাগ নয়। ভোগের পরিণতি নাশ এবং এবং ত্যাগের পরিণতি অমরতা। রস কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়, রস আপন বৃত্তির মধ্যেই রয়েছে। কেউ নাটকের দৃশ্যের মধ্যে রস পায়, আবার কেউ আকাশে যে নিত্য নূতন দৃশ্যের

অবতারণা হয় তাতে রস পায়। অর্থাৎ রস শিক্ষার বিষয়। রসরূপে ছেলেবেলায় যে শিক্ষা পাওয়া যায়, রসরূপে জনসাধারণ যে শিক্ষা পায়, তাই রস বলে গণ্য হয়। এক জাতির নিকট যা রসময় মনে হয় তা অপরজাতির নিকট রসহীন লাগে। এরূপ উদাহরণ আমরা পেতে পারি।

আবার যজ্ঞানুষ্ঠানকারী অনেক সেবক এইরূপ মনে করে যে আমরা নিষ্কামভাবে সেবা করছি অতএব লোকের নিকট হতে যা দরকারী তা নেওয়ার এবং যা অদরকারী তাও নেওয়ার পরোয়ানা পেয়েছি। এরূপ বিচার যে সেবকের মনে যখন আসে তখন হতে সে আর সেবক থাকে না সর্দ্দার হয়ে যায়। সেবার ভিতরে নিজের ব্যবস্থার বিচারের স্থানই নেই। সেবকের ব্যবস্থা প্রভু—ঈশ্বর দেখেন, কি সাহায্য দিতে হবে এবং যদি দিতে হয় তা তিনিই সেবককে দিবেন। এরূপ বিচার করে সেবক যা আসে তা নিজের করে বসে না। যা প্রয়োজন শুধু ততটাই নিয়ে বাকীটা ত্যাগ করবে। নিজের সাহায্য না পেলেও শান্ত থাকবে, ক্রোধহীন থাকবে এবং মনেও ব্যথিত হবে না। যাজ্ঞিকের প্রতিদান—সেবকের মজুরী যজ্ঞ—সেবাই। তাতেই তার সন্তোষ।

আবার সেবাকার্য্যের ভিতরে দায় শোধ ত নেইই। দায় ঠেকে শেষকালে হবে এমন নয়। নিজের কাজ হয়ত

সাজ সজ্জা করে করা, পরের কাজ বা বিনে পয়সায় করতে হবে অতএব যেমন ভাবে এবং যখন খুসী করলে চলবে এরূপ বিচার ও আচরণশীল ব্যক্তি যজ্ঞের মূলাক্ষরও জানে না। সেবায় ত ষোলকলা পূর্ণ করতে হয়, নিজের সমস্ত কলা বা বিদ্যা তাতে প্রয়োগ করতে হয়, এ প্রথম, পরে নিজের সেবা। মোট কথা এই যে শুদ্ধ যজ্ঞ যে করতে চায় তার নিজের কিছুই নেই। সে সমস্ত কৃষ্ণার্পণ করেছে।

যজ্ঞ—৩

[ব্যক্তিগত পত্র হতে]

চরখা ও ফরাসী ভাষা * শিক্ষা সম্বন্ধে আপনি লিখেছেন, এতেও সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে দোষ দেখছি। চরখায় সর্ব্বার্পণ করার পর সে সময় অন্য লাভ উঠাতে দিতে নেই। কেউ এসে কথা বলে যায় ত বিবেকের খাতির করি ; কিন্তু কথা

* চরকা কাটার সময় ফরাসী ভাষা শিখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে লিখিত এক পত্রের উত্তরে গান্ধীজী এই পত্র লিখেন।

বলে যায় তার চেয়ে শিক্ষা দিয়ে যায় এ কি দোষ এ ন্যায় এখানে চলে না। কথাবার্ত্তা হতে ত ইচ্ছা করলে বিরত হতে পারা যায়, আর কথাবার্ত্তা যে বলতে আসে সে ও দীর্ঘ সময় বসে কথা বলে না। কিন্তু শিক্ষক হওয়ার পর ত পূরা সময়ে বসে থাকা বাধ্যতামূলক। এ সব যখন যজ্ঞরূপে চরখা চালান হয় সেই সময়ের জন্য। আমার বেলায় এ সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করছি। চরখা চালাতে চালাতে যখন অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখন গতি, নম্বর ও সমানতার উপর তার প্রভাব পড়ে। কল্পনা করুন রোমা রোলাঁ অথবা বেঠোফেন পিয়ানো বাজাতে বসেছেন। তাতে এঁরা এরূপ তন্ময় হন যে কথাও বলতে পারেন না। এমন কি মনে মনেও অন্য চিন্তা করতে পারেন না। কলা ও কলাবিদ পৃথক নয়। এ যদি পিয়ানো সম্বন্ধে সত্য হয় তবে চরখা যজ্ঞ সম্বন্ধে কতটা বেশী পরিমাণে সত্য হওয়া উচিত? এরূপ আচরণ আজ হওয়া সম্ভব হয়নি এ কথা পৃথক। আমাদের বিচার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ শুদ্ধ রাখতে হবে তা হলে কোন না কোন দিন সেই প্রকার আচরণ করতে পারবই। পুনরায় সাবধান করে দিচ্ছি যে এতে অতীতের টিকা নেই। অতি অসম্পূর্ণ আমার টিকা করবার অধিকারই বা কোথায় আছে? যা জানি তা আমি নিজেই বা কোথায়

পুরাপুরি কার্য্যে পরিণত করছি? যদি করতাম তা হলে কবে সাত লক্ষ গ্রামে চরখার গুঞ্জন হত; এখন যা জানি সেই পরিমাণে যদি ষোল আনা আচরণ করতে পারতাম তবে এখানে বসে থাকলেও চরখা পবন বেগে প্রসার লাভ করত। 'যদিও এখন আমার মনের বাসনা আমার শক্তির অতীত তথাপি আমি মনে মনে নিশ্চয় চরখার ভক্ত। প্রভুর আদেশ হয় ত সেই স্বরূপ হয়ে যাব।' (রায় চাঁদ ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চেয়ে চুরি করেছি)। কিন্তু মালব্যজী যদি ভাগবৎ পুরাণ কথা বলতে বলতে পরিশ্রান্ত হন তবেই আমি চরখার সঙ্গীতের কথা বলতে পরিশ্রান্ত হব। চরখা পুরাণ ত কি ভাবেই বলা যায়? পুরাণ ত আমাদের পরবর্ত্তীগণ রচনা করবেন যদি আমরা রচনার যোগ্য করে যাই। এখন ত আমরা এর ভাঙ্গা চুরা সঙ্গীত রচনা করছি। শেষে তাতে কিরূপ স্বুর বেরোয় তার আধার আমাদের তপশ্চর্য্যা ও সমর্পণের উপর নির্ভর করবে। এখন গত পত্রের সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃতভাবে লিখব।

আমার মনে হয় আদর্শ হচ্ছে এই যে যজ্ঞের সময় মৌন থাকা এবং সে সময়ে চরখা অর্থাৎ খাদির বিষয়ে অথবা রাম নাম চিন্তা করা। রাম নামের ব্যাপক অর্থ করা চাই। ঠিক ভাবে দেখলে রাম নাম ত জ্ঞানে অজ্ঞানে সব সময় হওয়া চাই-ই, সঙ্গীতের সময় তাম্বুরার মত। কিন্তু যে

কাজ হাত করে তাতে একধ্যান না হলে সংকল্প করে রাম নাম আবৃত্তি করা উচিত। চরখা চালাতে চালাতে আমরা কথা বলি বা কিছু শুনি অথবা অন্য কিছু করি। এ ক্রিয়া যজ্ঞ ত নয়-ই। যদি এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য হয় তবে ততটা সময় তাতে তন্ময় হয়ে যাওয়া উচিত। এবং যার সমস্ত জীবন যজ্ঞরূপ এবং যে অনাসক্ত, সে এক-ই কাজ এক সময়ে করবে। এ জেনেও কম ও বেশী পরিমাণে আমিই প্রথম পাপী বনেছি। কারণ আমি কোনদিন নিশ্চিন্তে বসে নির্জ্জনে অথবা মৌন থেকে কাটিই না এমন বলা যায়। মৌন দিন কাটবার সময়ে চিঠি অথবা কারো কিছু বলবার থাকে ত তা শুনি। এ কুঅভ্যাস এখন পর্য্যন্তও যায় নি। এর পরে নুতন কথা কি যে আমি কাটা বিষয়ে বহু নিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত অপটু রয়েছি এবং ঘণ্টায় খুব কষ্টে ২০০ তার এখন কাটতে পারি? অন্য প্রকারেরও অনেক দোষ আমার বেলায় দেখছ:—যেমন কি তার ছিড়ে যাওয়া, মাল তৈরী করতে না পারা, টেকোর চামড়া সম্বন্ধে সামান্যজ্ঞান, তুলার জাত না জানা, সমানতা প্রভৃতি ঠিকভাবে করতে না পারা, সূতা পরীক্ষা করতে না পারা। এ কোন যাজ্ঞিকের শোভা পায়? এর পরে খাদি ঢিলে ভাবে চলছে তার মধ্যে নুতন কি? যদি দরিদ্র নারায়ণ থাকে, এবং তা আছেই, এবং যদি তার প্রসাদ খাদি হয় এবং

এ বলবার ও জানিয়ে লোক যাকে বল সে আমি তথাপি আমার আচরণ কিরূপ একাগ্রতাহীন? অতএব এজন্য অন্য কাউকে দোষ দেওয়ার মনই হয় না। আমি ত মাত্র আপনাকে আমার দোষ ও দুঃখের এবং তা হতে উৎপন্ন জ্ঞানের কথা বলছি। যদিও কাকার * সাথে এলোমেলোভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি তথাপি এতটা স্পষ্টভাবে আলোচনা আজই প্রথম আপনার সাথে করছি। এবং তা স্পষ্টও হল চরখার সাথে ফ্রেঞ্চ যুক্ত করা হতে। আবারও বলছি আপনি এভাবে করছেন তাতে আমি আপনার দোষ লেশমাত্রও দেখছি না। আমি চরখার কিরূপ কাঁচা মন্ত্রদ্রষ্টা তা দেখছি। মন্ত্র জেনেও তার বিধান পুরাপুরি পালন করি নাই, কাজেই মন্ত্র পুরা শক্তি দেখাতে পারেনি। একথা চরখায় বেলায় যেমন প্রযুজ্য তেমনি সমস্ত জীবনের ব্যাপারেই প্রয়োগ করে দেখুন। তাহলে কল্পনায় ত আপনি জীবনের অদ্ভুত শান্তি অনুভব করবেন এবং সফলতাও অনুভব করবেন। 'যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্' এর এই অর্থ। এরূপ করলে যতটা হয় ততটাই হাতে নিয়ে সন্তোষ লাভ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এরূপ করলেই আমরা নিজের এবং সমাজের তীব্রতম প্রগতিতে আমাদের অংশ গ্রহণ

---

* কাকা কালেলকারের

করব। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত না করা হয় ততক্ষণ তা হল পাণ্ডিত্য। প্রতিদিন এদিকে আচরণ ত হচ্ছে। বাইরে গেলে কি হবে তা দৈব জানে। যতটা আচরণ সম্ভবপর তা করে যান। যজ্ঞার্থে যত তার মনে করেন ততটা ত এরূপ শাস্ত্রীয় প্রণালীতে কাটুন। বাকী ত অবস্থানুযায়ী হিন্দুস্থানের দ্রব্য বৃদ্ধির জন্য করে যান। এখনও লিখবার মন রয়েছে, কিন্তু এখানেই সমাপ্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জ্জুন বললেন, 'আপনি জ্ঞানকে প্রকৃষ্ট বলছেন কাজেই আমি বুঝছি কর্ম্ম করার আবশ্যকতা নেই—সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পুনরায় কর্ম্মেরও স্তুতি করছেন অতএব যোগই শ্রেষ্ঠ এরূপ মনে হচ্ছে। এই দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ কোনটী তা আমাকে নিশ্চয় পূর্ব্বক বলুন, তবেই কতকটা শান্তি পাব'।

এ শুনে ভগবান বললেন, 'সন্ন্যাস মানে জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগ মানে নিষ্কাম কর্ম্ম। এ দুই-ই ভাল। কিন্তু যদি আমাকে পছন্দই করতে হয় তবে আমি বলছি যে যোগ অর্থাৎ অনাসক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম অধিকতর ভাল। যে মানুষ কারো কোন জিনিষে বা কাউকেও দ্বেষ করে না, কোন

প্রকার আকাঙ্ক্ষা রাখে না, সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হতে পৃথক থাকে সে সন্ন্যাসীই—সে কর্ম্ম করুক আর না করুক। এরূপ মানুষ সহজে বন্ধনমুক্ত হয়। অজ্ঞানী জ্ঞান এবং যোগকে পৃথক মনে করে, জ্ঞানী তা করে না। উভয় পথে একই পরিণাম হয়, অর্থাৎ উভয় পথেই একই স্থান পাওয়া যায়। কাজেই যে উভয়কে এক বলে জানে সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কারণ এই যে যার শুদ্ধ জ্ঞান বর্ত্তমান সে সঙ্কল্প করা মাত্রই কার্য্য সিদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ তার বাহ্য কর্ম্ম করবার আবশ্যকতা থাকে না। জনকপুরী যখন জ্বলছিল তখন অন্য সকলের ধর্ম্ম ছিল আগুন নিভাতে যাওয়া। জনকের সংকল্পেই আগুন নিভাবার সাহায্য মিলেছিল, কারণ তাঁর সেবকগণ ছিল তাঁর অধীন। তিনি যদি জলের কলসী নিয়ে ছুটতেন তবে পুরাপুরি লোকসান হত। অন্য সকলে তাঁর মুখ দেখত এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য ভুলে যেত, এবং বেশী হত ত তারা ব্যাকুল হয়ে জনককে রক্ষা করার জন্য ছুটত। কিন্তু সকলেই কিছু চট করে জনক হতে পারে না। জনকের অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। কোটি লোকের মধ্যে একজন বহু জন্মের সেবার ফলে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তা পেলে যে বিশেষ কোন শান্তি লাভ হয় এমনও নয়। উত্তরোত্তর নিষ্কাম কর্ম্ম করতে

করতে মানুষের সকল্প বল বেড়ে যায় এবং বাহ্য কর্ম্ম কমে যায়। ঠিকভাবে দেখলে তার এ খবরও পড়ে না এমন বলা যায়। এর জন্য তার কোন চেষ্টাও নেই। সে ত সেবাকার্য্যেই ডুবে থাকে এবং সেরূপ থাকার ফলে সেবাশক্তি এতটা বেশী বেড়ে যায় যে সেবা হতে বিশ্রাম নিতে জানেই না। তা হতে অবশেষে তার সঙ্কল্প হওয়া মাত্রই সেবা হয়ে যায়—অত্যন্ত গতিশীল বস্তু যেমন স্থির দেখায় ঠিক তেমনি। এরূপ মানুষ কিছু করছে না একথা বলা স্পষ্টতঃ অনুচিত। কিন্তু এরূপ অবস্থা সাধারণভাবে কল্পনাই করা যায়, অনুভব করা যায় না। তাই কর্ম্মযোগকে আমি বিশেষ বা শ্রেষ্ঠ বলেছি। কোটি কোটি লোক নিষ্কাম কর্ম্ম হতেই সন্ন্যাসের ফল পায়। যদি এরা সন্ন্যাসী হতে যায় তবে তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল উভয়দিকই নষ্ট হয়। সন্ন্যাসী হওয়ার বদলে মিথ্যাচারী হওয়ার পুরাপুরি সম্ভাবনা এবং কর্ম্ম হতে ত চ্যুত হয়েছেই অতএব সবই হারাল। কিন্তু যে মানুষ অনাসক্তি পূর্ব্বক কর্ম্ম করে শুদ্ধ হয়েছে, যে নিজের মনকে জয় করেছে, যে নিজের ইন্দ্রিয়কে বশে রেখেছে, যে সমস্ত জীবের সাথে নিজের ঐক্যসাধন করেছে এবং সবাইকে নিজের মত মনে করছে, সে কর্ম্ম করা সত্ত্বেও তা হতে বিমুক্ত থাকে; অর্থাৎ সে বন্ধনে পড়ে না। এরূপ

মানুষ বলা চলা প্রভৃতি কাজ করা সত্ত্বেও তার এই কাজগুলি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুসারে করছে এরূপ প্রতিভাত হয়, সে নিজে কিছুই করছে না। নীরোগ ও সুস্থ মানুষের শারীরিক ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হয়। তার পাকস্থলী প্রভৃতি নিজ নিজ নিয়মানুযায়ী কাজ করে, সেদিকে তার নজর দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ যার আত্মা নীরোগ ও সুস্থ তা শরীরের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিজে অলিপ্ত থাকে, কিছুই করেনা এরূপ বলা যায় তাই মানুষের উচিত সকল কর্ম্ম ব্রহ্মাকে অর্পণ করা, ব্রহ্মারই নিমিত্ত করা। অর্থাৎ সে কর্ম্ম করা সত্ত্বেও পাপ পুণ্যের স্তূপ রচনা করবে না। জলে থেকেও পদ্মের ন্যায় শুকনা থাকবে। অর্থাৎ যে অনাসক্তি শিখেছে সে যোগী কায়োমনবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করা সত্ত্বেও সঙ্গরহিত হয়ে, অহংভাব ছেড়ে আচরণ করে—শুদ্ধ হয় এবং শান্তি লাভ করে। অন্য অযোগী ফলে আসক্ত হওয়ার জন্য কয়েদীর মত নিজ কামনায় বদ্ধ থাকে। এই নবদ্বার যুক্ত দেহরূপী সহরে সমস্ত কর্ম্ম মন হতে ত্যাগ করে নিজে কিছু করে না বা করায়ও না এমন যে যোগী সে সুখে থাকে। সংস্কৃত, সংশুদ্ধ আত্মা পাপও করেনা, পুণ্যও করেনা। যে কর্ম্ম হতে আসক্তি দূর করেছে, অহংভাব নাশ করেছে, ফলত্যাগ করেছে সে জড়বৎ আচরণ করে,

নিমিত্তমাত্র হয়ে যায়; পাপপুণ্য তাকে কি করে স্পর্শ করতে পারে? এর বিপরীত, যে অজ্ঞানতায় পড়ে আছে সে রোজ গণনা করে 'এতটা পুণ্য করেছি, এতটা পাপ করেছি।' এবং এরূপ করতে করতে সে রোজ গর্ত্তে পতিত হয় এবং অবশেষে তার ভাগে পাপই রয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞানের সাহায্যে নিজের অজ্ঞানতা রোজ নাশ করে যায় তার কার্য্যে রোজ নির্ম্মলতা বেড়ে যায়, জগৎ তার কর্ম্মে পূর্ণতা ও পুণ্যতা দেখে। এরূপ মানুষের সমস্ত কর্ম্ম দেখতে স্বাভাবিক হয়। এরূপ মানুষ সমদর্শী। তার কাছে বিদ্বান, বিনয়ী, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর, বিবেকহীন—পশুর চেয়েও অধম মনুষ্য—এসবই সমান। অর্থাৎ সে সকলকে সমানভাবে সেবা করবে—এককে বড় ভেবে সম্মান দিবে আর অন্যকে ছোট ভেবে তুচ্ছ করবে এরূপ নয়। অনাসক্ত ব্যক্তি নিজেকে সকলের দেনাদার মনে করবে এবং সবাইকে নিজ নিজ পাওনা শোধ করবে এবং পূর্ণ ন্যায় করবে। এরূপ মানুষ এখানেই জগৎকে জয় করছে এবং সে ব্রহ্মময়! কেউ তার প্রিয় কার্য্য করলেও সে উৎফুল্ল হয় না, কেউ গাল দিলেও তার জন্য দুঃখিত হয় না। আসক্ত ব্যক্তি বাহির হতে নিজের সুখ খোঁজে, আর অনাসক্ত সর্ব্বদা নিজের অন্তর হতে শান্তি পায়, কারণ সে বাহির হতে নিজেকে টেনে

নিয়েছে এবং ইন্দ্রিয় জনিত ভোগমাত্র দুঃখের হেতু। অনাসক্ত ব্যক্তির অন্যের কাম ক্রোধ প্রভৃতি হতে উৎপন্ন উপদ্রব সয়ে নেওয়া উচিৎ। অনাসক্ত যোগী সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্যই নিযুক্ত থাকে। তার কোন সন্দেহ থাকে না। এরূপ যোগী বাহ্য জগৎ হতে নিরালা থাকে, প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করে অন্তর্দ্ধান হওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি হতে দূরে থাকে। সে আমাকেই সকলের মহেশ্বর মিত্র ও যজ্ঞাদির ভোক্তা স্বরূপ জানে এবং শান্তি লাভ করে।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

যারবাদা মন্দির
তাঃ ১৬.১২.৩০

[মঙ্গল প্রভাত]

শ্রীভগবান বললেন 'কর্ম্মফল ত্যাগ করে যে মানুষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে তাকে সন্ন্যাসী বলা যায় এবং যোগীও বলা যায়। সকল কাজ যে ত্যাগ করে বসে সে অলস। আসল কথা হচ্ছে মনে মনে আকাশ কুসুম রচনা করা ত্যাগ

করা। যে যোগ অর্থাৎ সমত্ব সাধন করতে চায় তার কর্ম্মবিনা চলেই না। যে সমত্ব লাভ করেছে তাকে শান্তি দেখাবে, অর্থাৎ এই যে তার বিচার মাত্র হতেই কর্ম্মের বল আসে। যখন মানুষ ইন্দ্রিয় বিষয়ে বা কর্ম্মে মগ্ন হয় না এবং মনের সমস্ত বিক্ষেপ দূর করে দেয় তখন সে যোগ সাধন করেছে—যোগারূঢ় হয়েছে একথা বলা চলে।

আত্মার উদ্ধার আত্মার দ্বারাই হয়। কাজেই বলতে পারা যায় যে নিজেই নিজের শত্রু বা মিত্র হয়। যে মনকে জয় করেছে তার আত্মা মিত্র, যে মন জয় করেনি তার আত্মা শত্রু। যে মনকে জয় করেছে তার পরিচয় এই যে তার কাছে শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান সবই সমান। যার জ্ঞান আছে, অভিজ্ঞতা আছে, যে অবিচল, যে ইন্দ্রিয় জয় করেছে এবং যার কাছে সোনা, মাটী, পাথর সমান বোধ হয় তার নাম যোগী। এরূপ মানুষ শত্রু, মিত্র, সাধু, অসাধু প্রভৃতি সকলের প্রতি সমভাব রাখে। এরূপ অবস্থা পেতে হলে আবশ্যক হচ্ছে মন স্থির করা, বাসনা ত্যাগ করা এবং একান্তে বসে পরমাত্মার ধ্যান করা। কেবল আসনাদি করা যথেষ্ট নয়। সমত্ব লাভেচ্ছু ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্যাদি মহাব্রত ঠিক ঠিক নিয়মমত পালন করা উচিত। এরূপ আসনবদ্ধ যমনিয়মাদি পালনকারী মানুষ

নিজের মন যদি পরমাত্মায় স্থির করে তবে তার পরম শান্তি লাভ হয়।

এরূপ সমত্ব পেটুকের মত যে খায় বা একান্ত উপবাস করে সে পায় না—অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও লাভ হয় না। সমত্বকামী ব্যক্তির পান, আহার, নিদ্রা জাগরণ প্রভৃতি সব বিষয়েই পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। একদিন খুব খাওয়া, পরের দিন উপবাস, একদিন খুব ঘুমান, পরের দিন জাগরণ, একদিন খুব কাজ করে পরের দিন অলস বসে থাকা এ যোগের লক্ষণই নয়। যোগীত সদা স্থিরচিত্ত থাকে এবং সে সমস্ত কামনা সহজে ত্যাগ করে। বায়ুহীন স্থানের দীপশিখার মত এরূপ যোগী স্থির থাকে। জগতের ঘটনাসমূহ অথবা তার মনোত্থিত বিচার তরঙ্গ সমূহ তাকে এধার ওধার টলাতে সমর্থ হয় না। এ যোগ আস্তে আস্তে কিন্তু দৃঢ়তা পূর্ব্বক চেষ্টা করলে সাধন করা যায়। মন চঞ্চল, তাই সে এধার ওধার ছুটাছুটি করে, তাকে আস্তে আস্তে স্থির করতে হয়। মন স্থির হলেই শান্তি মিলে। মনকে এরূপ স্থির করার জন্য সর্ব্বদা আত্মার চিন্তা করা উচিত। এরূপ মানুষ সকল জীবকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সকলের মধ্যে দেখে। কারণ সে আমাকে সকলের মধ্যে এবং সকলকে আমার

মধ্যে দেখে। আমাতে যে লীন হয়েছে, যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে তার আমিত্ব মিটে গিয়েছে, কাজেই যা অভিরুচি তা করা সত্ত্বেও সে আমাতেই লীন থাকে। অতএব তার দ্বারা অনুচিত কোন কাজ কখনো হওয়ার নয়।'

অর্জ্জুনের নিকট এরূপ যোগ কঠিন লাগল এবং তিনি বলে উঠলেন 'এরূপ আত্মস্থিরতা কিভাবে পাওয়া যায়? মন ত বাঁদরের মত। বায়ু নিরোধ করার মতই মন নিরোধ করা দুঃসাধ্য। এরূপ মন কিভাবে এবং কখন বশে আসে?'

ভগবান উত্তর দিলেন 'তুমি যা বলছ তা সত্য। কিন্তু রাগ দ্বেষ জয় করলে এবং চেষ্টা করলে কঠিনকে সহজ করা যায়। মন জয় না করলে যোগ সাধন হয় না এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

তখন অর্জ্জুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন 'ধরুন কোন মানুষের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু তার চেষ্টা কম তাই সে সফল হয় না। এরূপ মানুষের কিরূপ গতি হয়? ছিন্ন মেঘের মত সে নষ্ট হয় না ত?'

ভগবান বললেন 'এরূপ শ্রদ্ধাবানের নাশ হয়ই না। কল্যাণমার্গগামী লোকের দুর্গতি হয়ই না। এরূপ মানুষ মৃত্যুর পর কর্ম্মানুসারে পুণ্য লোকে থেকে পরে পৃথিবীতে আসে এবং পবিত্র ঘরে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ জন্ম

জগতে দুর্লভ। এই ঘরে তার পূর্ব্ব শুভ সংস্কারের উদয় হয়, তার বর্ত্তমান চেষ্টা তীব্র হয় এবং অবশেষে সে সিদ্ধি-লাভ করে। এরূপ চেষ্টা করতে করতে নিজ নিজ শ্রদ্ধা ও চেষ্টার শক্তি অনুযায়ী কেউ বা শীঘ্র কেউ বা বহু জন্মের পর সমত্ব লাভ করে। তপ, জ্ঞান, বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি এ সকলের চেয়ে সমত্ব শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যে তপাদি হতে শেষে ত সমতাই আসা চাই। তাই তুমি সমত্ব লাভ কর এবং যোগী হও। তাদের মধ্যেও যে নিজের সর্ব্বস্ব আমাতে অর্পণ করে এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমারই আরাধনা করে তাকে শ্রেষ্ঠ জেনো।'

এই অধ্যায়ে প্রাণায়াম আসনাদির স্তুতি রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তার সাথেই ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য যম নিয়ম প্রভৃতি পালনের আবশ্যকতা ভগবান বলেছেন। ইহা বুঝে নেওয়া অত্যাবশ্যক যে কেবল আসনাদি ক্রিয়া হতে কখনও সমত্ব লাভ হয় না। আসন প্রাণায়ামাদি মনস্থির করতে, একাগ্র করতে কতকটা সাহায্য করে, যদি তাও ঐ উদ্দেশ্যে করা যায়। নতুবা তাদিগকেও অন্য শারীরিক ব্যায়ামের মত বুঝেই শরীর সংগঠনের জন্য তার মূল্য নির্দ্ধারণ করবে। প্রাণায়ামাদির শারীরিক ব্যায়াম হিসাবে অনেক উপযোগিতা আছে এবং ব্যায়ামের মধ্যে এই ব্যায়াম

সাত্ত্বিক আমি এরূপ মনে করি। শারীরিক দৃষ্টিতে উহা শিখবার যোগ্য। কিন্তু তার মারফত সিদ্ধি সমূহ পাওয়ার এবং আশ্চর্য্য বস্তু সমূহ দেখাবার জন্য এ সব ক্রিয়া করা হয়, আমি দেখেছি তাতে লাভের বদলে লোকসান হয়। এই অধ্যায় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহার রূপে বুঝবার যোগ্য এবং চেষ্টাবান ব্যক্তিদিগকে আশ্বাস দিচ্ছে। হারলেও সমতা পাওয়ার চেষ্টা কখনও আমাদের ত্যাগ করা উচিত নয়।

সপ্তম অধ্যায়

তাঃ ২৩.১২.৩০
মঙ্গলপ্রভাত

ভগবান বললেন 'হে রাজা আমাতে চিত্ত লীন করে আমার আশ্রয় নিয়ে কর্ম্মযোগ আচরণশীল মানুষ নিশ্চয় পূর্ব্বক কিভাবে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে একথা আমি তোমাকে বলব। এই অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান আমি তোমাকে বলব তারপর অন্য আর কিছুই জানবার বাকী থাকবেনা।

হাজারের মধ্যে কচিৎ কেউ তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাকারীদের মধ্যে কচিৎ কেউ সফল হয়।

পৃথিবী, জল, আকাশ, তেজ, বায়ু তথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটপ্রকারের এক আমার প্রকৃতি। তাকে অপরা প্রকৃতি বলে এবং আমার অন্য প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি। ইহা জীবরূপ। এই দুই প্রকৃতি হতে অর্থাৎ দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ হতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাই সকলের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ আমি। মণিসমূহ যেমন সুতায় গাঁথা থাকে তেমনি এই জগৎ আমাতে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ কি, জলের যে রস তা আমি, সূর্য্যচন্দ্রের তেজ আমি, বেদের ওঁকার আমি, আকাশের ধ্বনি আমি, পুরুষের পরাক্রম আমি, মাটির সুগন্ধ আমি, অগ্নির তেজ আমি, প্রাণীমাত্রের জীবন আমি, তপস্বীর তপ আমি, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আমি, বলবানের শুদ্ধ বল আমি, জীবমাত্রের মধ্যে অবস্থিত ধর্ম্মের অবিরোধী কামনা আমি। সংক্ষেপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হতে উৎপন্ন যে যে ভাব আছে সে সমস্তই আমা হতে উৎপন্ন জেনো এবং তারা আমাকে অবলম্বন করেই থাকতে পারে। এই তিন ভাব বা গুণে লীন ব্যক্তি অবিনাশী আমাকে চিনতে পারে না, ইহাই আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। তাকে পার হওয়া কঠিন। কিন্তু যে

আমার শরণ নেয়, সে এই মায়া অর্থাৎ তিনগুণকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু যাদের আচার বিচারের ঠিকানা নেই এরূপ মূঢ় লোক আমার আশ্রয় কেন খুঁজবে? তারা ত মায়ায় পড়ে থেকে অন্ধকারেই ঘুরে বেড়ায় এবং জ্ঞান লাভ করে না। কিন্তু সদাচারী আমাকে ভজনা করে। এদের মধ্যে কেউ নিজের দুঃখ মিটাবার জন্য, কেউ আমাকে জানবার ইচ্ছা হতে কেউ কিছু পাওয়ার আশায় এবং কেউ বা কর্ত্তব্য বুঝে জ্ঞান পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে। আমাকে ভজনা করা অর্থ আমার জগৎকে সেবা করা। এই সেবকদের মধ্যে কেউ দুঃখে পড়ে, কেউ কোন লাভের আশায় কেউ 'চল দেখি কি হয় এরূপ বুঝে সেবা করে, আবার কেউ সম্যক্ বুঝে, তা ছাড়া থাকতেই পারে না তাই সেবাপরায়ণ থাকে। এই শেষোক্ত আমার জ্ঞানীভক্ত এবং আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় এরূপ বলা যায়। অথবা একথাও বলতে পার সে আমাকে সর্ব্বাধিক চিনেছে এবং আমার নিকটতম। এরূপ জ্ঞান মানুষ বহু জন্মান্তেই লাভ করে এবং তা লাভ করার পর আমি বাসুদেব ভিন্ন এ জগতে সে অন্য কিছু দেখেই না। কিন্তু যার কামনা রয়েছে সে ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভজনা করে। যার যেমন ভক্তি তদনুসারে ফল

প্রদানের কর্ত্তা ত আমিই। এরূপ কম বুদ্ধি সম্পন্নদের যে ফল লাভ হয় তাও এরূপই কম হয়, তাদের সন্তোষও ততটাতেই হয়। এরূপ লোক নিজেদের অল্প-বুদ্ধি বশতঃ মনে করে যে তারা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাকে জানতে সমর্থ, তারা বুঝে না যে আমার অবিনাশী এবং অনুপম স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং হাত, কান, নাক ইত্যাদির সাহায্যে জানতে পারাই যায় না। এ প্রকার আমি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা সত্ত্বেও আমাকে অজ্ঞানী লোক জানতে পারে না এ আমার যোগমায়া বলে জেনো। রাগ দ্বেষ হতে সুখ দুঃখাদি হয়েই থাকে এবং তাই জগৎ মূর্চ্ছা বা মোহ-গ্রস্থ রয়েছে। কিন্তু যারা তা হতে মুক্ত এবং যাদের আচার বিচার নির্ম্মল হয়েছে তারা ত নিজেদের ব্রতে নিশ্চল থেকে সর্ব্বদা আমাকেই ভজনা করে। তারা পূর্ণ ব্রহ্মরূপে সকল প্রাণীর ভিতরে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীয়মান জীব-রূপে অবস্থিত আমাকে এবং আমার কর্ম্মকে জানে। এরূপ যারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞরূপে জানে এবং সেই হেতু সমত্ব লাভ করে তারা মৃত্যুর পর জন্মমরণ বন্ধন হতে মুক্ত হয়, কারণ এতটা জানার পর তাদের মন অন্যত্র ঘুরে বেড়ায় না এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরময় দেখে তারা ঈশ্বরেই বিলীন হয়ে যায়।'

অষ্টম অধ্যায়

তাঃ ২৯.১২.৩০
সোমপ্রভাত

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি পূর্ণব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের নাম করেছেন কিন্তু আমি এ সকলের অর্থ বুঝিনি। আপনি আরো বলেছেন যে আপনাকে অধিভূতাদিরূপে জানে এমন সমস্ত প্রাপ্ত লোক মৃত্যুর সময় আপনাকে চিনতে পারে। এ সব আমাকে বুঝান।'

ভগবান উত্তর দিলেন 'যা সর্ব্বোত্তম নাশরহিত স্বরূপ তা পূর্ণব্রহ্ম, এবং প্রাণীমাত্রের কর্ত্তা ভোক্তারূপে যিনি দেহ ধারণ করে আছেন তিনি অধ্যাত্ম। প্রাণী মাত্রের উৎপত্তি যে ক্রিয়া হতে হয় তার নাম কর্ম্ম। অর্থাৎ এমনও বলা যায় যে, যে ক্রিয়া হতে উৎপত্তি মাত্র হয় তা কর্ম্ম। অধিভূত আমার বিনাশশীল দেহস্বরূপ এবং অধিযজ্ঞ হচ্ছে যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ উপরোক্ত অধ্যাত্ম স্বরূপ। এ প্রকার দেহরূপে, অবিবেকী জীবরূপে, শুদ্ধজীবরূপে এবং পূর্ণব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র আমিই। এবং এরূপ আমাকে যে মরণ সময় ধ্যান করে,

নিজেকে ভুলে যায়, কোন প্রকারের চিন্তা করে না, ইচ্ছা করে না। সে আমার স্বরূপ পাবেই এ বিষয়ে সন্দেহ করো না। মানুষ যে স্বরূপের ধ্যান সর্ব্বদা করে এমন কি অন্তকালেও যদি তারই ধ্যান করে তবে সে স্বরূপকে সে লাভ করে। কাজেই তুমি নিত্য আমারই স্মরণ করতে থাক। মন বুদ্ধি আমাতেই লীন করে দেও। তা হলেই আমাকে পাবে। তুমি বলবে চিত্ত এরূপ স্থির হয় না। তবে জেনো যে রোজকার অভ্যাস দ্বারা, রোজকার চেষ্টা দ্বারা এরূপ একাগ্রতা হয়ই। কারণ এখনই তোমাকে বলেছি যে দেহধারীও মূলবিচার করলে আমারই স্বরূপ। তাই মানুষের প্রথম হতেই নিজেকে তৈরী করা চাই যেন মৃত্যুকালে মন চঞ্চল না হয়, ভক্তিতে লীন থাকে, প্রাণ স্থির রাখে এবং সর্ব্বজ্ঞ, পুরাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও সকলকে পালন করার শক্তি ধারণ-কারী, যাকে চিন্তা করলেও শীঘ্র জানতে পারা যায় না, সূর্য্যের ন্যায় আঁধার—অজ্ঞান নাশকারী পরমাত্মারই স্মরণ করে।

বেদ সকল এ পরম পদকে অক্ষর ব্রহ্মনামে জানে। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগকারী মুনিগণ তাকে পান। এবং সে পদ লাভেচ্ছু সকলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে অর্থাৎ শরীর, বাক্য ও মনকে সংযত রাখে, বিষয় মাত্রকে তিন প্রকারে

ত্যাগ করে। ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে রেখে ওঁ উচ্চারণ করতে করতে আমারই চিন্তা করতে করতে যে স্ত্রী পুরুষ দেহত্যাগ করে সে পরম পদ লাভ করে। এরূপ লোকদের চিত্ত অন্য কোথাও বিচরণ করে না এবং এরূপ ভাবে যারা আমাকে পায়, তাদের দুঃখের ঘর স্বরূপ এই জন্ম পুনরায় পেতে হয় না। আমাকে পাওয়াই হচ্ছে এই জন্ম মরণ চক্র হতে উদ্ধারের উপায়।

মানুষ নিজের একশ বৎসর জীবন কালের দ্বারা কালের মাপ করে এবং সেই সময়ের মধ্যে হাজার রকমের জাল বিস্তার করে। কিন্তু কালত অনন্ত। হাজার হাজার যুগ ব্রহ্মার একদিন বলে জেনো। এর মধ্যে মানুষের একদিন বা একশ বৎসরের কি মূল্য? এত অল্প সময়ের গণনা করে বৃথা চেষ্টা কেন? এই অনন্ত কালচক্রে মানুষের জীবন যেন এক মুহূর্ত্ত, সেই সময়ের মধ্যে তার ঈশ্বরের ধ্যানই শোভা পায়। সে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে কেন ছুটে? ব্রহ্মার রাত্রিদিনে সৃষ্টি ও নাশ চলছেই এবং চলবেও।

সৃষ্টি ও বিনাশকারী ব্রহ্মা সেও আমারই স্বরূপ। এবং সে অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না। এরও অতীত আমার অন্য অব্যক্ত স্বরূপ আছে তার কতকটা বর্ণনা আমি তোমার নিকট করেছি। তাকে যে লাভ করে তার জন্ম মরণ

শেষ হয়ে যায়। কারণ এই যে এ স্বরূপের দিন রাত প্রভৃতি কোন দ্বন্দ্ব নেই, এ কেবল শান্ত অচল স্বরূপ। এর দর্শন অনন্যভক্তি হতেই হয়। এরই অবলম্বনে সমস্ত জগৎ অবস্থিত এবং সে স্বরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে।

এরূপ বলা হয় যে উত্তরায়ণের সময় শুক্লপক্ষের দিনেরবেলা যে মরে সে উপরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্মরণ করতে করতে আমাকে লাভ করে, আর যে দক্ষিণায়ণে কৃষ্ণপক্ষে রাত্রিকালে মরে তার পুনর্জন্মের ফের বাকী রয়েছে। এর অর্থ এরূপ করা যায় যে উত্তরায়ণ ও শুক্লপক্ষ নিষ্কাম সেবামার্গ আর দক্ষিণায়ণ ও কৃষ্ণপক্ষ স্বার্থমার্গ। সেবামার্গে মুক্তি এবং স্বার্থ মার্গে বন্ধন। সেবামার্গ—জ্ঞানমার্গ, স্বার্থমার্গ,—অজ্ঞান-মার্গ। জ্ঞানমার্গে বিচরণ কারীদের মোক্ষ, অজ্ঞানমার্গে বিচরণ-কারীদের বন্ধন। এই দুই মার্গ জানার পর মোহের বশীভূত হয়ে অজ্ঞানমার্গ কে পছন্দ করবে? এতটা জানার পর মনুষ্য মাত্রেরই সমস্ত পুণ্যফল ছেড়ে অনাসক্ত থেকে কর্ত্তব্য পরায়ণ থেকে আমার কথিত উত্তমস্থান লাভেরই চেষ্টা করা উচিত।

নবম অধ্যায়

তাঃ ৫,১,৩১
সোম প্রভাত

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান যোগীর উচ্চস্থান বর্ণনা করেছেন অতএব এখন তাঁর ভক্তির মহিমা বলাই বাকী রয়েছে। কারণ এই যে গীতোক্ত যোগী শুষ্কজ্ঞানী নয় বলহীন ভক্তও নয়। গীতোক্ত যোগী জ্ঞান ও ভক্তিময় অনাসক্ত কর্ম্মকর্ত্তা। তাই ভগবান বলছেন 'তোমার মধ্যে দ্বেষ নেই, এইজন্য তোমাকে আমি গুহ্যজ্ঞানের কথা বলছি—যা লাভ হলে তোমার কল্যাণ হবে। এই জ্ঞান সর্ব্বোপরি, পবিত্র এবং সহজেই আচরণ করা যেতে পারে। এতে যার শ্রদ্ধা নেই সে আমাকে পেতে পারে না। মনুষ্য প্রাণী আমার স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে না পারলেও এই জগতে তা ব্যাপ্ত রয়েছে। জগৎ তারই অবলম্বনে টিকে আছে, তা জগৎকে আশ্রয় করে নেই। আবার একভাবে এরূপও বলা যায় যে এ সব প্রাণী আমাতে নেই এবং আমিও তাদের মধ্যে নেই। যদিও আমি তাদের উৎপত্তির কারণ ও পোষণকর্ত্তা

তারা আমাতে নেই এবং আমি তাদের ভিতরে নেই এইজন্য যে তারা অজ্ঞানতার মধ্যে থেকে আমাকে জানে না, এবং তাদের মধ্যে ভক্তি নেই। এ-ই আমার চমৎকার এরূপ জেনো।

কিন্তু আমি প্রাণী সকলের মধ্যে নেই এরূপ মনে হলেও বায়ুর মত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছি। এ সমস্ত জীব যুগের অন্ত হলে লয় প্রাপ্ত হয় এবং আরম্ভ হলে পরে জন্মগ্রহণ করে। এসব কর্ম্মের কর্ত্তা আমি হলেও তারা আমাকে বন্ধন করে না কারণ ঐসবে আমি আসক্ত নই—উদাসীন। এসব কর্ম্ম হয়ে আসছে কারণ এই আমার প্রকৃতি, আমার স্বভাব। কিন্তু এরূপ আমাকে লোকে জানে না তাই তারা নাস্তিক থাকে, আমার অস্তিত্বই অস্বীকার করে। এরূপ লোক নিরর্থক আকাশ কুসুম রচনা করে, তাদের কামনাও নিরর্থক হয় এবং তারা অজ্ঞানতায় ভরপুর হয়ে থাকে তাই তাদিগকে আসুরীবৃত্তি সম্পন্ন বলা হয়। কিন্তু দৈবী বৃত্তি সম্পন্ন লোক আমাকে অবিনাশী ও সৃজনকর্ত্তা জেনে আমাকে ভজনা করে। তাদের সংকল্প দৃঢ় হয়, তারা সর্ব্বদা চেষ্টাশীল থাকে, আমার ভজন কীর্ত্তন করে এবং আমার ধ্যান করে। আবার কেউ কেউ আমি একই (অদ্বিতীয়) এরূপ মানে। কেউ কেউ আমাকে বহুরূপে মানে। আমার

অনন্ত গুণ অতএব বহুরূপ মান্যকারীগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে। কিন্তু এরা সবাই ভক্ত জেনো।

যজ্ঞের সংকল্প আমি, যজ্ঞ আমি, আমি পিতৃগণের আধার, যজ্ঞের বনস্পতি আমি, মন্ত্র আমি, আহুতি আমি, হোমে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্য আমি, অগ্নি আমি, এজগতের পিতা আমি, মাতা আমি, জগৎধারণ কর্ত্তা আমি, পিতামহ আমি, জানবার যোগ্যও আমি, ওঁকার মন্ত্র আমি, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ আমি, গতি আমি, পোষণ আমি, প্রভু আমি, সাক্ষী আমি, আশ্রয় আমি, কল্যাণেচ্ছুও আমি, উৎপত্তি ও নাশ আমি, শীত গ্রীষ্ম আমি, সৎ এবং অসৎও আমি।

ফলপ্রাপ্তির জন্যই লোকে বেদে বর্ণিত ক্রিয়া সমূহ করে। অতএব তারা যদি স্বর্গও পায় তবু তাদের জন্ম মৃত্যুর ফের থাকে। কিন্তু যারা এই ভাবেই আমার চিন্তা করতে থাকে এবং আমাকেই ভজনা করে তাদের সব ভার আমি উঠাই। তাদের অভাব আমি পূরণ করি এবং তাদিগকে আমিই রক্ষা করি। অন্য কেউ কেউ অন্যদেবতা সমূহে শ্রদ্ধা রেখে তাদিগকে ভজনা করে, তাদের ভিতরে অজ্ঞানতা রয়েছে। এ সত্ত্বেও অবশেষে ত তারা আমারই ভজনাকারী বলে গণ্য হয়। কারণ এই যে যজ্ঞমাত্রের আমিই প্রভু। কিন্তু আমার এ ব্যাপকতা না জেনে তারা শেষ অবস্থায় পৌঁছুতে

পারে না। দেবতা পূজক দেবলোক প্রাপ্ত হয়, পিতৃপূজক পিতৃলোক পায়, ভূতপ্রেতপূজক সেই লোক পায়, এবং জ্ঞান পূর্ব্বক আমাকে ভজনাকারীগণ আমাকে পায়। যারা ভক্তি পূর্ব্বক একটী মাত্র পাতা পর্য্যন্ত আমাকে দেয়, সেরূপ প্রযত্ন-শীল লোকদের ভক্তি আমি স্বীকার করি। তাই তুমি যা কিছু কর সে সমস্ত আমাকে অর্পণ করেই করে যাও। অতএব শুভাশুভ ফলের দায়িত্ব তোমার থাকে না। তুমি ত ফল মাত্রই ত্যাগ করেছ অতএব তোমার জন্মমরণ চক্র আর নেই। আমার কাছে সব জীব সমান। কেউ প্রিয় কেউ অপ্রিয় এরূপ কোন কথা নেই। কিন্তু যারা আমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ভজনা করে তারা ত আমাতেই আছে এবং আমিও তাদের মধ্যে আছি। এতে পক্ষপাত নেই, কিন্তু তারা নিজেদের ভক্তির ফল লাভ করেছে। এই ভক্তির বিশেষত্ব এই যে যারা একান্তভাবে আমাকে ভজনা করে তারা দুরাচারী হলেও সাধু হয়ে যায়। সূর্য্যের নিকটে যেমন অন্ধকার থাকে না তেমনি আমার কাছে এলেই মানুষের দুরাচার নাশ হয়। তাই তুমি নিশ্চয় জেনো যে আমার ভক্তি যারা করে তারা কখনও নাশ প্রাপ্ত হয়ই না। তারা ত ধর্ম্মাত্মা এবং শান্তি ভোগ করে। এই ভক্তির মহিমা এরূপ যে যারা পাপযোণিতে জন্মগ্রহণ করেছে বলে গণ্য তারা এবং নিরক্ষর স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যারা আমার আশ্রয় নেয় তারা

আমাকে পায়ই। অতএব পুণ্যকর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের কথা বলবারই কি? যে ভক্তি করে সে তার ফল পায়। অতএব তুমি অসার সংসারে জন্মলাভ করেছ ত আমাকে ভজনা করে তা উত্তীর্ণ হয়ে যাও। তোমার মন আমাতে লীন করে দেও, আমারই ভক্ত থাক, তোমার যজ্ঞও আমার জন্য কর, তোমার নমস্কারও আমাকে পৌঁছাও। যদি এ ভাবে তুমি আমাতে পরায়ণ হও এবং তোমার আত্মা আমাতে হোম করে শূন্যবৎ হয়ে যাও তবে তুমি আমাকেই পাবে।'

মঙ্গল প্রভাত

নোটঃ—এ হতে আমাদের বুঝা উচিত যে ভক্তি মানে ঈশ্বরে আসক্তি। অনাসক্তি শিক্ষারও এ সহজতম উপায়। তাই অধ্যায়ের সুরুতেই দৃঢ়তাপূর্ব্বক বলা হয়েছে যে ভক্তি হচ্ছে রাজযোগ এবং সহজপথ। হৃদয়ে বসলে সহজ নতুবা বিকট। অতএব তাকে 'জীবন দেওয়ার ন্যায় শক্ত' বলেও ধরা হয়। কিন্তু এ ত 'দর্শক জ্বলছে দেখে', 'ভিতরে যে পড়েছে সে মহাসুখ মানে' এরূপ। কবি লিখেছেন যে ফুটন্ত তেলের পাত্রের ভিতরে সুধন্ব হাসছিল আর বাইরে দাঁড়ান দর্শকগণ কাঁপছিল। নন্দ অন্ত্যজ অগ্নি পরীক্ষার সময় নেচেছিল এরূপ কথিত আছে। এ সব সেই সেই ব্যক্তিগণের বেলায় ঘটেছিল কি না তা পরীক্ষা করবার আবশ্যকতা নেই। যে কোন বস্তুতে লীন হয় তার এরূপই অবস্থা হয়ে থাকে। সে

আমিত্ব ভুলে যায়। কিন্তু প্রভুকে ছেড়ে অন্য বস্তুতে কে লীন হয়? 'চিনি ও আখের স্বাদ ছেড়ে তিক্ত নিমের রস আস্বাদ করো না', 'সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ ছেড়ে জোনাকী পোকার আলোর পেছনে যেয়ো না।' অতএব নবম অধ্যায় বলছে প্রভুতে আসক্তি—অর্থাৎ ভক্তি—বিনা ফলে অনাসক্তি অসম্ভব। শেষ শ্লোক সমস্ত অধ্যায়ের নির্যাস। তার অর্থ আমাদের ভাষায়—'তুমি আমাতে লীন হয়ে যাও।'

দশম অধ্যায়

তাঃ ১২.১.৩১
সোমপ্রভাত

ভগবান বললেন 'ভক্তের কল্যাণের জন্য পুনরায় বলছি শুন। দেবতা ও মহর্ষিগণ পর্য্যন্ত আমার উৎপত্তি জানে না, কারণ এই যে আমার উৎপত্তিই নেই। আমি তাদের এবং অন্য সকলের উৎপত্তির কারণ। যে জ্ঞানী আমাকে জন্মরহিত ও অনাদিরূপে জানে সে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়। কারণ এই যে পরমেশ্বরকে এ ভাবে জানবার পর এবং নিজেকে তাঁর প্রজা অথবা তাঁর অংশ হিসাবে জানবার পর মানুষের পাপ-বৃত্তি থাকতে পারে না। পাপবৃত্তির মূলই নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞানতা।

যেরূপ প্রাণীসকল আমা হতে উৎপন্ন হয়েছে সেরূপ তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল যথা—ক্ষমা, সত্য, সুখ, দুঃখ, জন্মমৃত্যু, ভয়-অভয় প্রভৃতিও আমা হতে উৎপন্ন হয়েছে। এসব আমার বিভূতি এরূপ যারা জানে তাদের সহজে সমতা উৎপন্ন হয় কারণ তারা অহংভাব ছেড়ে দিয়েছে। তাদের

চিত্ত আমাতেই লীন রয়েছে, তারা আমাকে সব অর্পণ করেছে, একে অন্যের মধ্যে আমার সম্বন্ধেই আলাপ আলোচনা করে; আমারই কীর্ত্তন করে এবং সন্তুষ্ট তথা আনন্দে থাকে। এরূপ যারা আমাকে প্রেমপূর্ব্বক ভজনা করে এবং আমাতেই যাদের মন রয়েছে তাদিগকে আমি জ্ঞান দেই এবং তার সাহায্যে তারা আমাকে পায়।'

তখন অর্জ্জুন স্তুতি করলেন ঃ—আপনিই পরমব্রহ্ম, পরম-ধর্ম্ম, পবিত্র, ঋষিগণ প্রভৃতিও আপনাকে আদিদেব, জন্মরহিত, ঈশ্বররূপে ভজনা করে এরূপ আপনিই বলেছেন। হে প্রভু! হে পিতা! আপনার স্বরূপ কেউ জানে না। আপনিই আপনাকে জানেন। এখন আপনার বিভূতি আমাকে বলুন এবং আপনার চিন্তা করতে করতে কি ভাবে আপনাকে জানতে পারব তা বলুন।

ভগবান উত্তর দিলেন ঃ—আমার বিভূতি অনন্ত, তার মধ্যে প্রধান প্রধান কিছু তোমাকে বলছি। সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমি অবস্থিত রয়েছি। আমিই তাদের আদি, মধ্য ও অন্ত (উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়)। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, উজ্জ্বল বস্তু সকলের মধ্যে প্রকাশমান সূর্য্য আমি, বায়ুগণের মধ্যে মরিচি, নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র, বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মন, প্রাণীগণের

চেতনাশক্তি, রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ, পশু সকলের মধ্যে সিংহ, পক্ষীদের মধ্যে গরুড় এবং ছলকারীদের মধ্যে দ্যূতক্রিয়া কর্তা আমাকেই জেনো। এ জগতে যা কিছু আছে তা আমার অনুমতি ভিন্ন থাকতেই পারে না। ভাল মন্দও আমি হতে দেই বলেই হয়। এরূপ জেনে মানুষের অভিমান ত্যাগ করা উচিত এবং মন্দ হতে নিজদিগকে রক্ষা করা উচিত। কারণ ভালমন্দের ফলদাতাও আমি। তুমি এতটা জেনে রেখো যে এ জগৎ সম্পূর্ণরূপে আমার বিভূতির এক অংশমাত্রের উপর টিকে আছে।

একাদশ অধ্যায়

তাঃ ১২.১.৩১
সোমপ্রভাত

অর্জ্জুন বিনয়পূর্ব্বক বললেন 'হে ভগবান, আপনি আত্মার সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তাতে আমার মোহ দূর হয়েছে। আপনিই সব, আপনিই কর্ত্তা, আপনিই সংহর্ত্তা, আপনি নাশ রহিত। সম্ভব হয়ত আপনার ঈশ্বরীয় রূপ আমাকে দেখান।'

ভগবান বললেন 'আমার রূপ হাজার হাজার এবং অনেক রংয়ের। তার মধ্যে আদিত্য, বসু, রুদ্র প্রভৃতিও অবস্থিত। আমাতে সমস্ত জগৎ—চর ও অচর—অবস্থিত। এ রূপ তুমি তোমার চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখতে পাবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, তা দ্বারা তুমি দেখ।'

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেনঃ—হে রাজন! ভগবান অর্জ্জুনকে এরূপ বলে নিজের যে অদ্ভুতরূপ দেখালেন তার বর্ণনা করা যায় না। আমরা ত রোজ এক সূর্য্য দেখে থাকি, কিন্তু মনে করুন যে এরূপ হাজার হাজার সূর্য্য

রোজ উঠছে তাহলে তাদের তেজ যেরূপ হত তার চেয়েও এ (ভগবানের রূপের) তেজের আঁচ অনেক বেশী ছিল। এর অলঙ্কার ও শস্ত্রও এরূপ দিব্য ছিল। তাকে দর্শন করে অর্জ্জুনের রোমাঞ্চ হল, তার মাথা ঘুরতে লাগলো এবং কাঁপতে কাঁপতে স্তুতি আরম্ভ করলেন :—

হে দেব! আপনার এই বিশাল দেহে আমি ত সব এবং সবাইকে দেখছি। ব্রহ্মা তার মধ্যে, মহাদেব তার মধ্যে, তার মধ্যে ঋষিগণ এবং সর্পও আছে। আপনার হাত মুখ গণনা করা যায় না। আপনার আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই। আপনার রূপ যেন তেজের পাহাড়! দেখলে চোখ ঝলসে যায়। ধগধগ করে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আপনি ঝকঝকে ও তপ্ত রয়েছেন। আপনিই জগতের আধার, আপনিই পুরাণ পুরুষ, আপনিই ধর্ম্মের রক্ষক। যে দিকে দেখি আপনার অবয়ব দেখতে পাই। সূর্য্য চন্দ্র ত যেন আপনার চক্ষু বলে মনে হচ্ছে। আপনিই এ পৃথিবী এবং আকাশব্যাপী রয়েছেন। আপনার তেজ সমস্ত জগৎকে তাপ দিচ্ছে। এ জগৎ থরথর করছে। দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতি সবাই হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে আপনার স্তুতি করছে। এ বিরাট রূপ এবং এ তেজ দেখে আমি ত ব্যাকুল হয়ে গিয়েছি, শান্তি ও ধৈর্য্য

থাকছে না। হে দেব! প্রসন্ন হউন। আপনার দাঁত-গুলি বিকট। দীপশিখার উপর যেমন পতঙ্গ এসে পড়ে তেমনি আপনার মুখের ভিতরে এ সমস্ত প্রাণী পড়ছে দেখছি এবং আপনি তাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করছেন। এ উগ্ররূপ-সম্পন্ন আপনি কে? আপনার প্রবৃত্তি বুঝতে পারছি না।

ভগবান বললেন:—আমি লোকদের নাশকারী কাল। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর এ সকলের নাশ নিশ্চিত জেনো। তুমি ত নিমিত্ত মাত্র।

অর্জ্জুন বললেন:—হে দেব! হে জগন্নিবাস! আপনি অক্ষর, সৎ, অসৎ এবং তারও অতীত যা, তাও আপনিই। আপনি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ। আপনি এজগতের আশ্রয়। আপনিই জানবার যোগ্য। বায়ু, যম, অগ্নি, প্রজাপতিও আপনিই। আপনাকে অসংখ্য নমস্কার। এখন আপনার মূল স্বরূপ ধারণ করুন।

এ শুনে ভগবান বললেন:—তোমার উপর প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আমার বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। বেদাভ্যাস, যজ্ঞ এবং অন্যান্য শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা, জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারাও এরূপ দেখা যায় না—যা তুমি আজ দেখেছ। এ দেখে তুমি হতভম্ব হয়ো না। ভয় ছেড়ে শান্ত হও, এবং আমার পরিচিত রূপ দেখ। আমার এ রূপ দর্শন দেবতাদেরও দুর্লভ।

এ রূপ দর্শন কেবল শুদ্ধভক্তি হতেই হতে পারে। যে নিজের সমস্ত কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করে, আমাতে পরায়ণ থাকে, আমার ভক্ত হয়, আসক্তি মাত্র ত্যাগ করে এবং প্রাণীমাত্রের প্রতিই প্রেমময় রহে, সেই আমাকে পায়।

নোট :—দশম অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়কেও আমি জেনে বুঝে সংক্ষেপ করেছি। এ অধ্যায় কাব্যময়। তাই তা মূল বা অনুবাদরূপে পুরাপুরিই বারবার পড়বার যোগ্য। তা হতে ভক্তি-রস উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। সে রস উৎপন্ন হয়েছে কিনা তা জানবার কষ্টিপাথর শেষ শ্লোক। সর্ব্বার্পণ এবং সর্ব্বব্যাপক প্রেম ভিন্ন ভক্তি হয় না। ঈশ্বরের কালরূপের মনন করলে এবং তার মুখের ভিতরে সৃষ্টি মাত্রকে বিলীন হতে হবে—প্রতি মুহূর্ত্তে কালের এ কাজ চলছেই—এর জ্ঞান এলে সর্ব্বার্পণ এবং সকল জীবের সাথে ঐক্য সহজ হয়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এ মুখের ভিতরে আমাদিগকে এক অনিশ্চিত অজ্ঞাত সময়ে পড়তেই হবে। সেখানে ছোট বড়, নীচু উঁচু, স্ত্রীপুরুষ, মানুষ ও ইতর প্রাণীর ভেদ নেই। সব কালেশ্বরের একগ্রাস, এ জেনে আমরা দীন বা শূন্যবৎ হই না কেন? কেন সকলের সাথে মিত্রতা বদ্ধ হই না? যে এরূপ করে তার কাছে কালের স্বরূপ ভয়ঙ্কর বলে মনে হবে না বরং শান্তির স্থান হবে।

দ্বাদশ অধ্যায় *

তাঃ ৪.১১.৩০

মঙ্গলপ্রভাত

আজ ত দ্বাদশ অধ্যায়ের মর্ম্ম দেওয়া স্থির করেছি। এ ভক্তিযোগ। বিয়ের সময় দম্পতিকে পাঁচ যজ্ঞ করতে হয়, সেই পাঁচ যজ্ঞের এক যজ্ঞের মত এই অধ্যায়কেও কণ্ঠস্থ করে মনন করতে তাদিগকে বলা হয়। ভক্তি ছাড়া জ্ঞান ও কর্ম্ম শুষ্ক এবং বন্ধন স্বরূপ হওয়াও সম্ভব। অতএব ভক্তিময় হয়ে গীতার এই মনন সুরু করি।

অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ—সাকার এবং নিরাকার ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বললেনঃ—যে আমার সাকার রূপকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মনন করে, উহাতে লীন হয়ে যায় সেই শ্রদ্ধাবান আমার ভক্ত। কিন্তু যে নিরাকার তত্ত্বের ভজনা করে এবং উহাকে ভজনা করবার

---

* লিখবার তারিখ হতে ইহা সুস্পষ্ট যে এই অধ্যায় গান্ধীজী প্রথম লিখেন। মূল গুজরাটী পুস্তক ইহা প্রথম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা অধ্যায়গুলি পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া স্থির করি।

জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম করে, সমস্ত জীবের প্রতি সমভাব রাখে, উহাদের সেবা করে, কাউকেও উঁচু বা নীচু মনে করে না, সেও আমাকে লাভ করে। তাই এই দুয়ের মধ্যে অমুক শ্রেষ্ঠ এ কথা বলা যায় না। কিন্তু দেহধারীর পক্ষে পুরাপুরি-ভাবে নিরাকারের পূজা অসম্ভব। নিরাকার হচ্ছে নির্গুণ, কাজেই মানুষের কল্পনারও অতীত। তাই সমস্ত দেহধারীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সাকারেরই ভক্ত। অতএব তুমি আমার সাকার বিশ্বরূপের মধ্যেই তোমার মন লীন করে দেও, সব তাকে অর্পণ করে দেও। যদি এ করতে না পার তবে চিত্ত-বিকার রোধ করবার অভ্যাস কর, অর্থাৎ যম নিয়মাদি পালন করে, প্রাণায়াম আসন প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে মনকে বশীভূত কর। যদি ইহাও করতে না পার তবে যা কিছু কর তা আমারই নিমিত্ত করছ এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তোমার সকল কাজ কর। তা হলে তোমার মোহ মমতা কমে আসবে এবং তুমিও তেমন তেমন নির্ম্মল ও শুদ্ধ হতে থাকবে এবং তোমাতে ভক্তিরস আসবে। যদি এ-ও করতে না পার তবে কর্ম্মমাত্রেরই ফলত্যাগ কর, অর্থাৎ কর্ম্মফলের ইচ্ছা ছাড়। তোমার ভাগে যে কাজ এসে যায় তা করে যাও। মানুষ ফলের কর্ত্তা হতেই পারে না। অনেক কারণের সমাবেশে ফল উৎপন্ন হয়, অতএব তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হয়ে যাও। এই

যে চার প্রকারের উপায় আমি বলেছি তার মধ্যে কোনটা উঁচু বা কোনটা নীচু এরূপ মনে করো না। এর মধ্যে যেটা তোমার উপযোগী হয় তা হতেই ভক্তিরস গ্রহণ কর। এরূপ মনে হয় উপরে যম নিয়ম প্রাণায়াম আসনাদির যে পথ বলেছি তা হতে শ্রবণ মনন প্রভৃতি জ্ঞানমার্গ সহজ, এবং জ্ঞানমার্গ হতে উপাসনারূপ ধ্যান সহজ, এবং ধ্যান হতে কর্ম্মফল ত্যাগ সহজ। কিন্তু সকলের পক্ষে একই জিনিষ সমান সহজ হয় না, আবার কারো কারো ত সকল পথই গ্রহণ করতে হয়। এদের একের সাথে অন্যের মিল ত আছেই। যে ভাবে হোক তোমাকে ত ভক্ত হতে হবে। যে পথে ভক্তিলাভ হয় সেই পথে লাভ কর। ভক্ত কাকে বলা যায় তা ত আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। ভক্ত কারো উপর দ্বেষ করে না, কারো প্রতি বৈরভাব রাখে না। সকল জীবের সাথে মৈত্রীভাব রাখে, জীবমাত্রের প্রতিই করুণা শিক্ষা করে, এরূপ করবার জন্য মমতা ত্যাগ করে, আমিত্ব ত্যাগ করে, শূন্যবৎ হয়ে যায়। ভক্ত দুঃখ সুখ সমান জ্ঞান করে, কেহ দোষ করলে তাকে ক্ষমা করে (এই বুঝে যে সে নিজের দোষের জন্য জগতের নিকট ক্ষমাভিখারী), সন্তুষ্ট থাকে, শুভ সংকল্প হতে কখনও বিচলিত হয় না, মন বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত আমাতে অর্পণ করে। তা হতে লোকের কোন উদ্বেগ হয় না, ভয়ও হয়

না। সে নিজেও লোকদের নিকট হতে কোন দুঃখ বা ভয় পায় না। আমার ভক্ত হর্ষ শোক ভয় প্রভৃতি হতে মুক্ত, তার কোন প্রকারের ইচ্ছা হয় না, সে পবিত্র ও কুশল। সে বড় বড় আরম্ভ ত্যাগ করে, আপন সংকল্পে দৃঢ় থেকেও শুভ ও অশুভ উভয় প্রকারের পরিণাম বা ফল ত্যাগ করে অর্থাৎ সে ফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে। তার শত্রুই বা কে মিত্রই বা কে? তার মানই বা কি অপমানই বা কি? সে মৌনী হয়ে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থেকে সে একেলা নয় (ভগবান তার সাথী) এই ভাবে বিচরণ করে এবং সকল অবস্থায় স্থির থাকে। যে এই প্রকারে শ্রদ্ধাবান হয়ে আচরণ করে সে আমার প্রিয় ভক্ত।

নোট :—

প্রশ্ন :—ভক্ত আরম্ভ করেনা এর মানে কি তা দু এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাবেন কি?

উত্তর :—ভক্ত আরম্ভ করেনা এর অর্থ এই যে সে কোন ব্যবসায়ের কল্পনাজাল মনে মনে সৃষ্টি করে না। বেপারী হয়ে আজ কাপড়ের কারবার করছে, আগামী কাল কাঠের ব্যবসা করে কারবার বাড়াবার চেষ্টা করছে অথবা কাপড়ের আজ এক দোকান আছে কাল আরও পাঁচটী দোকান খুলে বসে, এর নাম আরম্ভ। ভক্ত

এর মধ্যে পড়ে না। সেবা কার্য্যের বেলায়ও এ নিয়ম খাটে। আজ খাদির মারফতে, কাল গো সেবার মারফতে, পরশু কৃষিকার্য্যের দ্বারা, আবার চতুর্থদিনে ডাক্তারীর মারফতে সেবা—এই প্রকারের সেবক কখনও ছুটাছুটি করে না। তার ভাগে যে কাজ আসে তা পুরাপুরিভাবে করে যায়। যেখানে 'আমি' নেই সেখানে আমার করবার কি আছে? 'ভগবান আমাকে সূতার তাঁরে বেঁধে যেমন টানেন তেমন তেমন ঐ টানকে প্রেমের কাটারী বলে মনে হয়।' ভক্তের সকল আরম্ভ ভগবান রচনা করেন। তার সকল কাজ জলধারার ন্যায় স্বাভাবিকভাবে চলে, এইজন্য সে সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। সর্ব্বারম্ভ ত্যাগের অর্থও এই। সর্ব্বারম্ভের অর্থ শুধু সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি বা কার্য্য নহে, কিন্তু কার্য্য করার বিচার বা চিন্তা, কল্পনা কুসুম রচনা করা। তার ত্যাগ মানে আরম্ভ না করা, কল্পনা কুসুম তৈরী করার অভ্যাস হয়ে থাকে ত ত্যাগ করা। 'আজ ইহা পেলাম, এই মনোরথ পূর্ণ হল' ইহা আরম্ভ ত্যাগের বিপরীত। আমার মনে হয় এর মধ্যে তোমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এসে গিয়েছে, যদি কিছু বাকী থাকে জিজ্ঞাসা করো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভগবান বললেন ঃ—এই শরীরের অন্য নাম ক্ষেত্র এবং যে তাকে জানে সে ক্ষেত্রজ্ঞ। সকল শরীরে অবস্থিত আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জেনো। এবং যা দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভিতরে প্রভেদ জানতে পারা যায় তাই হচ্ছে সত্যি জ্ঞান। পঞ্চ মহাভূত—পৃথিবী, জল, আকাশ, তেজ ও বায়ু, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এক মন, পাঁচ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ শরীর যাদের দ্বারা তৈরী তাদের এক হয়ে থাকবার শক্তি, চেতন-শক্তি, শরীরের পরমাণু সমূহের একে অন্যের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকবার গুণ এই সব মিলে বিকারযুক্ত ক্ষেত্র হয়েছে। এই শরীর এবং তার বিকার জানা উচিত কারণ তাদিগকে ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের জন্য জ্ঞান দরকার। এই জ্ঞান মানে অভিমান ত্যাগ, দম্ভত্যাগ, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শুদ্ধতা, স্থিরতা, বিষয়ের উপর সংযম, বিষয়ে বৈরাগ্য, অহংভাব ত্যাগ, জন্মমৃত্যু, জরা এবং তার আনুষঙ্গিক রোগ, দুঃখ এবং নিত্য সংগঠিত দোষ সমূহের পূর্ণজ্ঞান, স্ত্রী-পুত্র, ঘর বাড়ী, জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি হতে মন সরিয়ে নেওয়া

এবং মমতা ত্যাগ, নিজের পছন্দ বা অপছন্দসই জিনিষ সংঘটিত হোক সে বিষয়ে সমতা রাখা, ঈশ্বরে অনন্য ভক্তি, নির্জ্জনে বাস, সংসারে থাকলেও ভোগ্যবস্তুর ভোগে অরুচি, আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান পিপাসা এবং অবশেষে আত্মদর্শন। এর বিপরীত যা তা অজ্ঞান। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর যা জানবার যোগ্য বস্তু অর্থাৎ জ্ঞেয় এবং যাকে জানলে পর মোক্ষলাভ হয় তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুন। তিনি জ্ঞেয় অনাদি পরব্রহ্ম। তিনি অনাদি, কারণ এই যে, তাঁর জন্ম নেই। যখন কিছু ছিলনা তখনও পরব্রহ্ম ছিলেনই। তিনি সৎও নন, অসৎও নন, উভয়ের অতীত। অন্য দৃষ্টিতে তাঁকে সৎ বলা যায়, কারণ তিনি নিত্য। তাঁর নিত্যতা সত্ত্বেও তাঁকে মানুষ জানতে পারে না তাই তাঁকে সৎ-এরও অতীত বলেছি। তাঁহা হতে কিছুই খালি নয় অর্থাৎ সবই তাঁর দ্বারা পূর্ণ। তাঁকে হাজার হাজার হাত পা বিশিষ্ট বলা যেতে পারে। তাঁর এরূপ হাত পা প্রভৃতি আছে এরূপ মনে হলেও তিনি ইন্দ্রিয় রহিত, তাঁর ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নেই, ইন্দ্রিয় বিষয়ে তিনি অলিপ্ত। ইন্দ্রিয় ত আজ আছে কাল নেই। পরব্রহ্মত নিত্য রয়েছেনই। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সবাইকে ধারণ করে রয়েছেন তাই তাঁকে গুণ সমূহের ভোক্তা এরূপ বলা যেতে পারে, তথাপি তিনি

গুণরহিত। যেখানে গুণ রয়েছে সেখানে বিকার আছে কিন্তু পরব্রহ্ম বিকাররহিত। গুণ মানেই বিকার। ইনি প্রাণী সমূহের বাইরে এরূপও বলা হয়, কারণ এই যে, যে তাঁকে জানেনা তার কাছেত তিনি বাইরেই রয়েছেন। কিন্তু তিনিত প্রাণী সমূহের ভিতরে রয়েছেনই, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপক। সেইরূপই তিনি গতিশীল এবং স্থিরও বটে। তিনি সূক্ষ্ম, তাই তাঁকে জানা যায় না এমন। তিনি দূরেও আবার নিকটেও। নামরূপ বিনাশশীল তথাপি তিনি ত আছেনই। এই ভাবে তিনি অবিভক্ত। কিন্তু অসংখ্য প্রাণীর ভিতরে রয়েছেন এরূপও বলছি, কাজেই তিনি বিভক্তরূপেও প্রতিভাত হন। তিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং তিনিই মারেন। প্রকাশমান বস্তু সমূহের প্রকাশ তিনি, তিনি অন্ধকারের অতীত—জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা তাঁর মধ্যে অবস্থিত। এই সকলের মধ্যে অবস্থিত পরব্রহ্মই জানবার যোগ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়। জ্ঞান মাত্র লাভ কর তা কেবল তাঁকে লাভ করার অর্থেই।

প্রভু এবং তাঁর মায়া দুই-ই অনাদি কাল হতে চলে আসছে। মায়া হতে বিকার উৎপন্ন হয় এবং তা হতে অনেক প্রকারের কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। মায়ার জন্যই জীব সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যের ভোক্তা বনে। এরূপ জেনে যে অলিপ্ত থেকে কর্ত্তব্য করে

সে কাজ করলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। কারণ সে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকেই দেখে এবং তাঁর প্রেরণা ভিন্ন একটি পাতা পর্য্যন্তও নড়েনা এরূপ জেনে সে নিজের সম্বন্ধে অহংভাব মানেই না, নিজেকে শরীর হতে পৃথক দেখে এবং বুঝে যে আকাশ সর্ব্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও যেমন অলিপ্তই থাকে তেমনি জীব শরীরের ভিতরে থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের সাহায্যে অলিপ্ত থাকতে পারে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীভগবান বললেনঃ— যে উত্তম জ্ঞান লাভ করে ঋষিমুনিগণ পরমসিদ্ধি পেয়েছেন আমি তোমাকে তা পুনরায় বলছি। সেই জ্ঞান লাভ করে এবং তদনুযায়ী ধর্ম্ম আচরণ করে মানুষ জন্মমৃত্যুর ফের হতে রক্ষা পায়। হে অর্জ্জুন আমি জীব মাত্রেরই মাতাপিতা এরূপ জেনো।—প্রকৃতি হতে উদ্ভূত তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দেহীকে বেঁধে রাখে। এই তিন গুণকে ক্রমান্বয়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম

বলা চলে। এর মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ এবং প্রকাশমান, এবং তাই তার সঙ্গ সুখদায়ক হয়। আসক্তি ও তৃষ্ণা হতে রজোগুণের উৎপত্তি এবং তা মানুষকে কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে ফেলে দেয়। তমোগুণের মূল অজ্ঞান, মোহ, কাজেই তার দ্বারা মানুষ ভ্রমময় এবং অলস হয়ে যায়। অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে সত্ত্ব হতে সুখ, রজঃ হতে ঝামেলা এবং তমঃ হতে আলস্য উৎপন্ন হয়। রজঃ এবং তমঃকে দাবিয়ে সত্ত্ব, সত্ত্ব ও তমঃকে দাবিয়ে রজঃ এবং সত্ত্ব ও রজঃকে দাবিয়ে তমঃ জয় লাভ করে। দেহের সকল ব্যাপারে যখন জ্ঞানের অনুভব দেখতে পাওয়া যায় তখন তাতে সত্ত্বগুণই প্রধানভাবে কাজ করছে এরূপ জেনো। যেখানে লোভ, ঝামেলা, অশান্তি, স্পর্দ্ধা, দেখতে পাওয়া যায় সেখানে রজোগুণের বৃদ্ধি জেনো। আর যেখানে অজ্ঞান, আলস্য, মোহ অনুভূত হয় সেখানে তমঃর রাজ্য এরূপ জেনো। যার জীবন সত্ত্বগুণ প্রধান হয় সে মৃত্যুর পর জ্ঞানময় নির্দ্দোষ লোকে জন্মগ্রহণ করে, রজঃ প্রধান হয়ত কোলাহলময় লোকে এবং তমঃ প্রধান হলে মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কল নির্ম্মল, রাজসিক কর্ম্মের কল দুঃখময় এবং তামসিক কর্ম্মের কল অজ্ঞানময়। সাত্ত্বিক লোকের উচ্চগতি, রাজসিকের মধ্যম এবং তামসিকের অধোগতি হয়।

মানুষ যখন গুণাতীত অন্য কর্ত্তা দেখে না এবং আমাকে গুণাতীত বলে জানে তখন সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। দেহে অবস্থিত এই তিনগুণকে যে দেহী অতিক্রম করে যায় সে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর দুঃখ পার হয়ে অমৃতময় মোহ লাভ করে।

গুণাতীতের এরূপ সুন্দর গতি হয় অতএব তার লক্ষণ কিরূপ, তার আচরণ কিরূপ এবং কিভাবে তিনগুণকে অতিক্রম করে যায় অর্জ্জুন এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

ভগবান উত্তর দিলেনঃ— যে মানুষ নিজের উপর যা কিছু এসে পড়ে, তা প্রকাশ হোক, কি প্রবৃত্তি হোক মোহ হোক, জ্ঞান হোক, ঝামেলা হোক, কি অজ্ঞান হোক, তার জন্য দুঃখ বা সুখ জ্ঞান করে না; যে গুণত্রয়ের সম্বন্ধে প্রশান্ত থেকে বিচলিত হয় না, গুণসমূহ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এই বুঝে যে স্থির থাকে, যে সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করে, যার কাছে লোহা পাথর ও সোনা সমান, যার প্রিয় অপ্রিয় বলে কিছু নাই, নিন্দা ও প্রশংসা যাকে স্পর্শ করতে পারে না, যার কাছে মান অপমান সমান, যে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাব রাখে যে সর্ব্বারম্ভ ত্যাগ করেছে তাকে গুণাতীত বলা যায়। এরূপ লক্ষণ বলেছি তার জন্য ভয় করো না অথবা কপালে

হাত দিয়ে অলস হয়ে বসে থেকো না। আমি যা বলেছি তাত সিদ্ধের অবস্থা। সেই অবস্থায় পৌঁছবার রাস্তা এই ঃ অব্যভিচারী ভক্তিযোগের সাহায্যে আমার সেবা কর। তৃতীয় অধ্যায় হতে স্বরু করে তোমাকে বলেছি যে কর্ম্ম বিনা, প্রবৃত্তি বিনা কেউ শ্বাস পর্য্যন্ত নিতে পারে না, অর্থাৎ কর্ম্মত দেহীমাত্রকে আঁকড়ে আছে। যে গুণসমূহকে অতিক্রম করে যেতে চায় সে সাধকের উচিত সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করা এবং ফলের ইচ্ছা পর্য্যন্ত না করা। এরূপ করলে তার কর্ম্ম তার প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ এই যে ব্রহ্ম আমি, মোক্ষ আমি, সনাতন ধর্ম্ম আমি, অনন্ত স্নুখ আমি, যা কিছু বল তা আমি। মানুষ শূন্যবৎ হলে আমাকেই সর্ব্বত্র দেখে। ইহা গুণাতীত।

(২৫.১.৩২ মৌনদিন)

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবান বললেন ঃ—এই সংসারকে দুভাবে দেখা যেতে পারে। এক এইঃ যার মূল উর্দ্ধে, যার শাখা নীচে এবং যাতে বেদরূপী পাতা আছে এরূপ পিপ্পল গাছের মত যে সংসারকে দেখে সে বেদজ্ঞ জ্ঞানী। অন্য প্রকার এই ঃ— সংসাররূপী বৃক্ষের শাখা উপর ও নীচ ব্যাপী রয়েছে; তাতে তিনগুণ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিষয়রূপ অঙ্কুর আছে এবং সেই বিষয় সমূহ জীবকে সংসারে কর্ম্ম বন্ধনে ফাঁসায়। এ বৃক্ষের স্বরূপ জানা যায় না, না তার আদি, অন্ত, না তার অবস্থিতির স্থান।

ইহা দ্বিতীয় প্রকারের সংসারবৃক্ষ, যদিও তার মূল বরাবর ভিতরে প্রবেশ করেছে তথাপি তাকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা কাটতে হবে যাতে আত্মা এরূপ লোকে পৌঁছে যেখান হতে তার আর সংসার আবর্ত্তে ফিরতে না হয়। এবং এরূপ করবার জন্য সে নিরন্তর ঐ আদি পুরুষকে ভজনা করে, যার মায়ার সাহায্যে এই পুরাতন প্রবৃত্তি প্রসৃত হয়েছে। যিনি মান মোহ ছেড়েছেন, সঙ্গদোষ জয় করেছেন, যিনি আত্মাতে লীন, বিষয়ে বিমুক্ত, যাঁর কাছে সুখ দুঃখ সমান তিনি জ্ঞানী, তিনি অব্যয় পদ লাভ করেন।

সেই স্থানে কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি অগ্নির আলো দানের আবশ্যকতা নাই। যেখানে যাওয়ার পর আর ফিরতে হয় না, তা আমার পরম স্থান।

সংসারে আমার সনাতন অংশ জীবরূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন সমেত ছয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। যখন জীব দেহ ধারণ করে এবং ত্যাগ করে তখন বায়ু যেমন নিজ স্থানের গন্ধকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে তেমনি এ জীবও ইন্দ্রিয় সমূহকে সঙ্গে নিয়ে বিচরণ করে। কান, চোখ, ত্বক, জিভ ও নাক তথা মন এই সবকে আশ্রয় করে জীব বিষয় উপভোগ করে। গতিশীল, স্থির এবং ভোগ্য বস্তু ভোগের গুণযুক্ত এই জীবকে মোহগ্রস্থ অজ্ঞানী চিনতে পারে না। জ্ঞানী চিনে। যত্নবান যোগী নিজের ভিতরে অবস্থিত এ জীবকে চিনে। কিন্তু যে সমভাবরূপী যোগসাধন করেনি, সে যত্ন করলেও তাকে চিনতে পারে না।

সূর্য্যের যে তেজ জগৎকে আলোকিত করে, চন্দ্রকিরণ, অগ্নির তেজ সে সমস্ত আমার তেজ বলে জেনো। আমার শক্তির সাহায্যে শরীরে প্রবেশ করে আমি জীবগণকে ধারণ করে আছি। রস উৎপাদনকারী সোমরূপে ওষধিমাত্রকে পোষণ করছি। প্রাণীমাত্রের দেহের ভিতরে থেকে জঠরাগ্নি স্বরূপ হয়ে প্রাণ অপান বায়ুকে সমান করে চার প্রকারের

অন্ন পরিপাক করছি। সকলের হৃদয়ে আমি অবস্থিত আছি। আমা হতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তাদের অভাব হয়। সমস্ত বেদের দ্বারা জানবার যোগ্য সে আমি। বেদান্তও আমি, বেদজ্ঞও আমি।

এ সংসারে ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ নাশশীল ও নাশ-রহিত এই দুইটী পুরুষ আছে এরূপ বলা হয়। এর মধ্যে জীবকে ক্ষর, তার মধ্যে স্থিরভাগে অবস্থিত আমি অক্ষর এবং তারও অতীত উত্তম পুরুষ তাকে পরমাত্মা বলা হয়। আমিই সেই অব্যয় ঈশ্বর যে ত্রিলোকে প্রবেশ করে তাদিগকে পালন করছে, তাই আমি ক্ষর এবং অক্ষরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং সংসারে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে প্রসিদ্ধ। এরূপ যে জ্ঞানী আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে সে সব জানে এবং আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে।

হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন, এ অতি গুহ্য শাস্ত্র আমি তোমাকে বলেছি। এ জেনে মানুষ বুদ্ধিমান হয় এবং নিজের ধ্যেয়কে পায়।

(৩১,১,৩২, রাত্রি)

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবান বললেনঃ—এখন আমি তোমাকে ধর্ম্মবৃত্তি এবং অধর্ম্মবৃত্তির ভেদ বলছি। ধর্ম্মবৃত্তি সম্বন্ধে ত আমি পূর্ব্বে অনেক কথা বলেছি, তথাপি তার লক্ষণ বলে যাচ্ছি। যার মধ্যে ধর্ম্মবৃত্তি আছে তার মধ্যে নির্ভয়তা, অন্তঃকরণের শুদ্ধি, জ্ঞান, সমতা, ইন্দ্রিয়দমন, দান, যজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাস, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ. ত্যাগ, শান্তি, কারো ছিদ্র প্রকাশ না করা বা অপৈশুণতা, সমস্ত জীবে দয়া, অলোলুপতা, কোমলতা, মর্য্যাদা, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অন্তর ও বাহিরের স্বচ্ছতা, অদ্রোহ (পরকে হনন করার ইচ্ছা মনের মধ্যে না হতে দেওয়া) এবং নিরভিমানতা হয়।

যার মধ্যে অধর্ম্মবৃত্তি রয়েছে তার ভিতরে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কঠোরতা এবং অজ্ঞান দেখতে পাবে।

ধর্ম্মবৃত্তি মানুষকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। অধর্ম্ম-বৃত্তি তাকে বন্ধনের মধ্যে ফেলে। হে অর্জ্জুন, তুমি ত ধর্ম্মবৃত্তি নিয়েই জন্মেছ।

অধর্ম্মবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃতভাবে বলছি যেন লোকে সহজে উহা ত্যাগ করে।

অধর্ম্মবৃত্তি সম্পন্ন লোক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ভেদ জানে

না, তার শুদ্ধ অশুদ্ধ বা সত্য অসত্যের জ্ঞান হয় না, কাজেই তার আচার ব্যবহারের ঠিকানাই বা কোথা হতে হবে? তার কাছে জগৎ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, জগতের কোন নিয়ন্তা নেই, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ এই তার জগৎ, কাজেই এতে বিষয় ভোগ ভিন্ন অন্য কোন বিচারই নেই।

এরূপ বৃত্তিসম্পন্ন লোকের কাম ভয়ানক হয়, তার মতিমন্দ হয়। এরূপ লোক নিজের দুষ্ট বিচারকে আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং তার সমস্ত প্রবৃত্তি জগতের নাশের জন্যই হয়। এর কামনার অন্তই হয় না, সে দম্ভ, মান ও অহঙ্কারে মত্ত থাকে।

এই জন্য তার চিন্তারও শেষ নেই, তার নিত্য নূতন ভোগের প্রয়োজন, শত শত আশার কেল্লা তৈরী করে, এবং নিজের কামনা পূরণের জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করতে ন্যায় অন্যায়ের ভেদ রাখেই না।

'আজ এই পেয়েছি, কাল এই অন্যটী পাব, এই শত্রুকে আজ মেরেছি, পুনরায় অন্যকে মারব, আমি বলবান, আমার নিকট ঋদ্ধিসিদ্ধি রয়েছে, আমার ন্যায় অন্য কে, কীর্ত্তি-লাভের জন্য যজ্ঞ করব, দান করব এবং আনন্দ করব' মনে মনে এরূপ মেনে সে মন্দ মন্দ হাসে এবং অবশেষে মোহজালে ফেঁসে নরকবাস করে।

এরূপ আস্থরী লোক নিজের অহঙ্কারে মত্ত থেকে পরনিন্দায় রত থেকে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের দ্বেষ করে এবং তাই সে বারংবার আস্থরীযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

কাম, ক্রোধ, লোভ আত্মার নাশকারী ও নরকের তিন দ্বার স্বরূপ। সকলেরই এই তিন ত্যাগ করা উচিত। এই তিন ত্যাগকারী কল্যাণ মার্গে যেয়ে থাকে এবং পরমগতি লাভ করে।

যে অনাদি সিদ্ধান্তরূপ শাস্ত্র ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় ভোগে লিপ্ত থাকে তার সুখ মিলে না এবং কল্যাণ মার্গেস্থিত শান্তিও মিলে না। তাই কার্য্য অকার্য্য নির্ণয় করবার জন্য যাদের অনুভূতি হয়েছে এমন লোকের নিকট হতে অবিচল সিদ্ধান্ত জেনে নেওয়া উচিত এবং তা অনুসরণ করে আচার বিচার নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

যাঃ মঃ
৭.২.৩২.

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন ;—যারা শিষ্টাচার ত্যাগ করে ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করে তাদের গতি কিরূপ হয় ?

ভগবান উত্তর দিলেন :—শ্রদ্ধা তিন প্রকারের—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। যার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেরূপ মানুষ হয়। সাত্ত্বিক মানুষ দেবতাকে, রাজসিক যক্ষ রাক্ষসকে এবং তামসিক ভূতপ্রেতকে ভজনা করে।

কিন্তু কার শ্রদ্ধা কিরূপ তা সহসা জানতে পারা যায় না। তার আহার, তপ, যজ্ঞ, দান কিরূপ এসব জানতে হবে আবার এরাও সব তিনপ্রকারের রয়েছে তা তোমাকে বলছি।

যে আহার দ্বারা আয়ু, নির্ম্মলতা, বল, আরোগ্য, সুখ এবং রুচি বাড়ে সেই আহারকে সাত্ত্বিক বলা যায়। যা ঝাল, টক, অতিশয় মসলাযুক্ত ও গরম সে খাদ্য রাজসিক এবং তা হতে দুঃখ ও রোগ উৎপন্ন হয়। যে পক্কান্ন বাসি, দুর্গন্ধযুক্ত, এঁটো বা অন্যভাবে অপবিত্র হয়েছে তা তামসিক খাদ্য বলে জেনো।

যে যজ্ঞ করার মধ্যে ফলের ইচ্ছা নেই, যা কর্ত্তব্য-রূপে তন্ময়তা সহকারে নিষ্পন্ন হয়, তা সাত্ত্বিক বলে গণ্য।

যার মধ্যে ফলের আশা আছে আবার দম্ভও আছে তা রাজসিক যজ্ঞ জেনো। যাতে কোন নিয়ম নেই, কোন সৃষ্টি নেই, মন্ত্র নেই, ত্যাগ নেই, সে যজ্ঞ তামসিক।

সাধুজনের পূজা, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা—শারীরিক তপ। সত্য, প্রিয়, হিতকরবচন এবং ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ বাচিক তপ। মনের প্রসন্নতা, সৌম্য, মৌন, সংযম, শুদ্ধ ভাবনাকে মানসিক তপ বলা হয়। সমভাব হতে ফলেচ্ছা ত্যাগ করে এরূপ শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপ যা করা হয় তাকে সাত্ত্বিক তপ বলা যায়। যে তপ মানের আশায় দম্ভপূর্ব্বক করা হয় তা রাজসিক জেনো এবং যে তপ পীড়া বা দুরাগ্রহবশতঃ কিম্বা অন্যের নাশের জন্য করা হয়, যাতে শরীরে অবস্থিত আত্মার নিরর্থক ক্লেশ হয় সে তপ তামসিক।

দেওয়া উচিত এইজন্য, ফলেচ্ছা ব্যতীত, দেশকাল পাত্র বিচার করে যে দান করা হয় তা সাত্ত্বিক।

যাতে প্রতিদানের আশা রয়েছে এবং যা দিতে সংকোচ বোধ রয়েছে সে দান রাজসিক। দেশ কালাদির বিচার না করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বা বিনা সম্মানে প্রদত্তদান তামসিক।

বেদে ব্রহ্মার বর্ণন ওঁ তৎসৎরূপে করেছে, এবং তাই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি ক্রিয়া উহা উচ্চারণ

পূর্ব্বক করে। ওঁ অর্থাৎ একাক্ষর ব্রহ্ম, তৎ অর্থাৎ তিনি, সৎ অর্থাৎ সত্য কল্যাণরূপ। অর্থাৎ ঈশ্বর এক, তিনিই আছেন, তিনিই সত্য, তিনিই কল্যাণকারী। এইরূপ ভাবনা রেখে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি হতে যে যজ্ঞাদি করে তার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক এবং সে শিষ্টাচার না জানার দরুণ বা জানা সত্ত্বেও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি বশতঃ তা হতে পৃথক কিছু করলেও সে দোষ রহিত।

কিন্তু যে কার্য্য ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি ভিন্ন হয় তা শ্রদ্ধাবিহীন বলে গণ্য, তা অসৎ।

যাঃ মঃ

১৪.২.৩২.

অষ্টাদশ অধ্যায়

গত ষোল অধ্যায় চিন্তা করার পর অর্জ্জুনের মনে এখনও সন্দেহ রয়ে গেল, কারণ এই যে গীতোক্ত সন্ন্যাস তার কাছে প্রচলিত সন্ন্যাস হতে পৃথক লাগছে। ত্যাগ এবং সন্ন্যাস এই দুইটী কি পৃথক বস্তু?

এই সন্দেহ দূর করবার জন্য ভগবান এই শেষ অধ্যায়ে গীতার শিক্ষার সার দিচ্ছেন।

কতক কর্ম্মের ভিতরে কামনা ভরা থাকে, অনেক প্রকারের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য মানুষ অনেক উদ্যম করে। এসব কাম্যকর্ম্ম। অন্য কতকগুলি আবশ্যক বা স্বাভাবিক কর্ম্ম যথা শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া, দেহ রক্ষার জন্য পান, আহার, পরিধান, শয়ন ও বসা প্রভৃতি। এছাড়া তৃতীয় প্রকারের কর্ম্ম পারমার্থিক। এর মধ্যে কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ হচ্ছে গীতার সন্ন্যাস এবং কর্ম্মমাত্রের ফলত্যাগ গীতামান্য ত্যাগ।

আবার এমন কথাও বলা যায় যে কর্ম্মমাত্রের মধ্যে অল্পদোষ ত রয়েইছে। তথাপি যজ্ঞার্থে অর্থাৎ পরোপকারার্থে করণীয় কর্ম্মত্যাগ করা যায় না। যজ্ঞের মধ্যে দান এবং তপ এসেই পড়ে। কন্তু পরমার্থের সম্বন্ধেও আসক্তি, মোহ হওয়া উচিত নয়, নইলে তাতেও দোষ ঢুকবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোহের বশীভূত হয়ে নিয়ত কর্ম্মত্যাগ তামস। দেহের কষ্ট হয় এরূপ বুঝে যে ত্যাগ করা হয় তা রাজসিক। কিন্তু সেবাকার্য্য করা উচিত এইরূপ ভাবনা হতে ফলেচ্ছা বিনা হয়ত তা-ই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ। অর্থাৎ এই ত্যাগে কর্ম্মমাত্রের ত্যাগ নেই, কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফলত্যাগ রয়েছে, এবং অন্য প্রকারের অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ ত রয়েছেই। এরূপ ত্যাগীর মনে সন্দেহ উঠে না। তার ভাবনা শুদ্ধ এবং সে সুবিধা অসুবিধার চিন্তা করে না।

যে কর্ম্মফল ত্যাগ করে না তার ত ভালমন্দ ফল ভোগ করতেই হয় এবং তাই সে বন্ধনেই রয়ে যায়। যে ফলত্যাগ করেছে সে বন্ধনমুক্ত হয়।

আর কর্ম্মসম্বন্ধে মোহ কি? নিজেই কর্ত্তা এরূপ অভিমান মিথ্যা। কর্ম্মমাত্রের সিদ্ধির পাঁচ কারণঃ—স্থান, কর্ত্তা, সাধন, ক্রিয়া এবং তদুপরি শেষ দৈব।

এরূপ জেনে মানুষের অভিমান ছাড়া উচিত এবং যে আমিত্ব ছেড়ে যা কিছু করে তা করা সত্ত্বেও করছে না এরূপ বলা যেতে পারে। কারণ তাকে সে কর্ম্ম বন্ধন করে না। এরূপ নিরভিমান শূন্যবৎ মানুষ সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় যে সে মারলেও মারে না। এর অর্থ এই নয় যে কোনও মানুষ শূন্যবৎ হয়েও হিংসা করে এবং অলিপ্ত থাকে; কারণ

এই যে নিরভিমান ব্যক্তির হিংসা করার প্রয়োজনই হয় না।

কর্ম্মের প্রেরণার ভিতরে তিন বস্তু রয়েছেঃ—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা। এবং তার অঙ্গ তিনঃ—ইন্দ্রিয়, ক্রিয়া এবং কর্ত্তা। কি করতে হবে তা জ্ঞেয়, তা করবার প্রণালী জ্ঞান, এবং যিনি জানেন তিনি পরিজ্ঞাতা। এই প্রকারে প্রেরণা হওয়ার পর কর্ম্ম হয়, তার কারণ ইন্দ্রিয়। যা করতে হবে তা ক্রিয়া এবং তা যিনি করেন তিনি কর্ত্তা। এরূপ বিচার হতেই আচরণ হয়। যার দ্বারা আমরা প্রাণী মাত্রের ভিতরে একই ভাব দেখি অর্থাৎ সব ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও গভীরভাবে দেখলে ত একই প্রতিভাত হয় তা সাত্ত্বিক জ্ঞান। তার বিপরীত অর্থাৎ যা পৃথক দেখায় তা পৃথকই মনে হয় উহা রাজসিক জ্ঞান। এবং যেখানে কোন খবর পাওয়া যায় না বা সমস্ত বিনা কারণ মিলে জুলে রয়েছে এরূপ মনে হয় তা তামস জ্ঞান।

জ্ঞানের ন্যায় কর্ম্মেরও বিভাগ করা যায়। যেখানে বাঞ্ছা নেই, রাগদ্বেষ নেই; সে কর্ম্ম সাত্ত্বিক। যেখানে ভোগের ইচ্ছা রয়েছে, যেখানে আমি করছি এরূপ অভিমান আছে এবং তাই ঝামেলা আছে তা রাজসিক কর্ম্ম। যেখানে পরিণামের, বিনাশের বা হিংসার বা শক্তির বিচার

নেই এবং যা মোহের বশীভূত হয়ে করা যায় তা তামসিক কর্ম্ম।

কর্ম্মের ন্যায় কর্ত্তাও তিন প্রকার জেনো। কর্ম্মকে জানবার পর কর্ত্তাকে জানবার মুস্কিল ত হয়ই না। যার আসক্তি নেই, অহংকার নেই, তথাপি যার মধ্যে দৃঢ়তা আছে, সাহস আছে এবং তবুও যার ভালমন্দ ফলের জন্য হর্ষশোক নেই, সে হচ্ছে সাত্ত্বিক কর্ত্তা। রাজসিক কর্ত্তার আসক্তি থাকে, লোভ থাকে, হিংসা থাকে, হর্ষশোক ত থাকেই; কাজেই কর্ম্মফলের ইচ্ছার কথা ত জিজ্ঞাসা করবারই আর কি? এবং ব্যবস্থাবিহীন, দীর্ঘসূত্রী, হঠকারী, শঠ, অলস সংক্ষেপে সংস্কারবিহীন সেই তামসিক কর্ত্তা।

বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখের ভিন্ন ভিন্ন রকম জেনে নেওয়া ভাল। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধন মোক্ষ প্রভৃতির ভেদ সাত্ত্বিক বুদ্ধি বরাবর করে ও জানে। রাজসিক বুদ্ধি এ ভেদ করে ত যায় কিন্তু বহুলাংশে মিথ্যা বা বিপরীত করে। আর তামসিক বুদ্ধি ত ধর্ম্মকে অধর্ম্ম মানে, সব কিছু উল্টাই দেখে।

ধৃতি মানে ধরে থাকবার শক্তি, কিছু গ্রহণ করলে তাতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবার শক্তি। এ শক্তি কম বেশী পরিমাণ সকলের মধ্যেই রয়েছে। যদি তা না হত

তবে জগৎ এক মূহূর্ত্তও টিকতে পারত না। যার মধ্যে মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সাম্য আছে, সমানত্ব আছে এবং একনিষ্ঠা আছে সেই ধৃতি সাত্ত্বিক। যার প্রভাবে মানুষ ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ আসক্তিপূর্ব্বক ধারণ করে সেই রাজসিক। যে ধৃতি মানুষকে নিদ্রা, ভয়, শোক, নিরাশা, অহংকার প্রভৃতি ছাড়তে দেয় না তা তামষিক।

সাত্ত্বিক সুখ তা-ই যাতে দুঃখের অনুভব নেই, যা আরম্ভের সময় বিষের মত লাগে কিন্তু আমরা জানি যে পরিণামে তা-ই অমৃতময় এবং যাতে আত্মা প্রসন্ন থাকে। বিষয় ভোগ যা সুরুতে মধুর লাগে কিন্তু পরে বিষের মত হয়ে যায় তা রাজসিক সুখ। আর যাতে কেবল মূর্চ্ছা, আলস্য, নিদ্রাই থাকে তা তামসিক সুখ।

এরূপ বস্তুমাত্রের তিনভাগ করা যায়। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণও এই তিনগুণের কম ও বেশীর জন্য হয়েছে। ব্রাহ্মণের কর্ম্মে শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, অনুভব, আস্তিকতা থাকা চাই। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হওয়া, দান রাজ্যপরিচালন শক্তি থাকা চাই। ক্ষেতী, গো-রক্ষা ও ব্যবসা বৈশ্যের কর্ম্ম এবং শূদ্রের কর্ম্ম সেবা। এর অর্থ এই নয় যে একে অন্যের গুণ একে অন্যের ভিতরে থাকেই না অথবা এসব গুণ

শিক্ষা পাওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু উপরোক্ত গুণ সমূহ বা কর্ম্মের দ্বারা সেই সেই বর্ণ চিনতে পারা যায়। যদি প্রত্যেক বর্ণের গুণ কর্ম্ম জানা যায় তবে একে অন্যের ভিতরে দ্বেষভাব হয় না এবং হানিকারক স্পর্দ্ধাও হয় না। এখানে উঁচু নীচু ভাবনার স্থানই নেই। কিন্তু যদি সবাই নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী নিষ্কামভাবে নিজ নিজ কর্ম্ম করে যায় তবে সেই সেই কর্ম্ম করেই মোক্ষের অধিকারী হয়। তাই বলা হয়েছে যে সত্যিই পরধর্ম্ম সহজ লাগলেও এবং স্বধর্ম্ম সারহীন মনে হলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বভাবজনিত কর্ম্মে পাপ না হওয়া সম্ভব, কারণ এই যে তাতেই নিষ্কামতা রক্ষা হয়, অন্য কিছু করার ইচ্ছার মধ্যেই কামনা এসে যায়। আবার যেমন অগ্নিমাত্রের মধ্যেই ধুঁয়া আছে তেমনি কর্ম্মমাত্রের ভিতরে দোষ ত আছেই, কিন্তু স্বভাবজাত কর্ম্ম ফলেচ্ছা বিনা করলে কর্ম্মের দোষ তাতে লাগে না।

এভাবে স্বধর্ম্ম পালন করে যে শুদ্ধ হয়েছে, যে মনকে বশে রেখেছে, যে পাঁচ বিষয়কে ছেড়েছে, যে রাগদ্বেষ জয় করেছে, যে একান্তসেবী অর্থাৎ অন্তর্ধ্যানে থাকতে পারে, যে অল্পাহার করে মনবাক্য শরীরকে সংযত রাখে, যে ঈশ্বরধ্যানে নিরন্তর নিযুক্ত থাকে, যে অহংকার কাম,

ক্রোধ, পরিগ্রহ ইত্যাদি ত্যাগ করেছে, সে শান্তযোগী ব্রহ্ম-ভাব পাওয়ার যোগ্য। এরূপ মানুষ সকলের প্রতি সমভাব সম্পন্ন থাকে এবং হর্ষশোক করে না। এরূপ ভক্ত ঈশ্বর-তত্ত্ব ঠিকঠিকভাবে জানে এবং ঈশ্বরে লীন হয়। এভাবে যে ভগবানের আশ্রয় নেয় সে অমৃতপদ পায়। তাই ভগবান বলছেন ঃ—আমাতে সব অর্পণ কর, মৎপরায়ণ হও এবং বিবেকবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে আমাতে চিত্ত লীন করে দাও। এরূপ করলে সমস্ত দুঃখ ও সন্তাপ মিটে যাবে, কিন্তু যদি আমিত্ব রেখে আমার কথা না শুন তবে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। শ' কথার এক কথা এই যে সমস্ত ঝঞ্ঝাট ত্যাগ করে আমারই শরণ লও তবে তুমি পাপমুক্ত হবে। যে তপস্বী নয়, যে ভক্ত নয়, যার শুনবার ইচ্ছা নেই এবং যে আমার দ্বেষ করে তাকে এ জ্ঞান বলো না। কিন্তু এ পরমগুহ্য জ্ঞান যে আমার ভক্তকে দিবে, সে আমার ভক্তি করার জন্য অবশ্য আমাকে লাভ করবে।

অবশেষে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন ঃ— যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধারী পার্থ, সেখানে শ্রী, বিজয়, বৈভব এবং অবিচল নীতি আছে।

এখানে কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বিশেষণ দেওয়া হয়েছে, তাই তার শাশ্বত অর্থ শুদ্ধ অনুভব জ্ঞান, এবং ধনুর্ধারী পার্থ

বলে এরূপ সূচনা দেওয়া হয়েছে যে যেখানে এরূপ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের অনুসরণকারী ক্রিয়া আছে সেখানে পরম নীতির অবিরোধী মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়ে থাকে।

যাঃ মঃ ২১. ২. ৩২.

সমাপ্ত

• জন-কল্যাণ গ্রন্থমালা •

১। **গান্ধী-কথা**—মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত, সম্পাদনা করেছেন—'সেবাসঙ্ঘের' পক্ষ থেকে শ্রীযুত রঘুনাথ মাইতি।

দাম : এক টাকা বার আনা

২। **নেতাজীর জীবনী ও বাণী**—সম্পাদনা করেছেন—শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ এম, এস-সি, বি-এল। **দাম : দুই টাকা**

৩। **মহারাজ নন্দকুমার**—সম্পাদনা করেছেন—প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী। ভাষা সরল এবং সুললিত।

দাম : আট আনা

৪। **সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন**—সম্পাদনা করেছেন—তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুত সুকুমার রায়। ইহাতে গফুর খাঁনের সম্পূর্ণ জীবনী ও খোদাই খিদ্‌মদ্ আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

দাম : এক টাকা চারি আনা

৫। **নবাব মীরকাশেম**—সম্পাদনা করেছেন—শ্রীযুত শ্রীপতিচরণ বোয়াল বি. এ., বি. টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীন বাংলার ইতিহাস, বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা সিরাজের এবং পলাশীর ইতিহাস সম্বলিত। **দাম : এক টাকা**

৬। **জওহরলালের গল্প**—মুক্তি-সংগ্রামের নায়ক পণ্ডিতজীর অপূর্ব-জীবন কাহিনী ধ্রুবতারার মত আমাদের স্বাধীনতার পথে পৌঁছে দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের পুরোহিতের এই জীবন কাহিনী ভাষায় অঙ্কিত করেছেন—সুনিপুণ তরুণ সাহিত্যিক—শ্রীযুত প্রভাত বসু। **দাম : এক টাকা চারি আনা**

৭। **কংগ্রেস রথ-সারথী যাঁরা**—বর্ত্তমান ভারতের ভাগ্য বিধাতা যাঁরা, তাঁদের পরিচয় না জানা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মাঝে স্বাধীনতার আলোক যাঁরা দেখিয়েছেন—নব অভ্যুদয়ের সেই মনিষীদের জীবন কথা সংক্ষিপ্তভাবে রূপ দিয়েছেন—সুনিপুণ সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রভাত বসু। **দাম : আড়াই টাকা**

• গণ-সংযোগ গ্রন্থমালা •

১। **আগষ্ট সংগ্রাম—মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার—** সম্পাদনা করেছেন—তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুত সুকুমার রায় ও শ্রীযুত অজিত বসুমল্লিক। **দাম: দুই টাকা**

২। **অহিংস বিপ্লব**—সম্পাদনা করেছেন—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী। **দাম: আট আনা**

৩। **গান্ধীবাদের পুনর্ব্বিচার**—সম্পাদনা করেছেন—এন. এম. দান্তওয়ালা। Gandhism Reconsidered এর বঙ্গানুবাদ।
দাম: বার আনা

৪। **মুক্তির গান**—সম্পাদনা করেছেন—তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, গণ-পরিষদের সদস্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সামন্ত। ১১৫টী জাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপিসহ শ্রেষ্ঠ সংকলন। **দাম: আড়াই টাকা**

৫। **স্বদেশী কবিতা**—সম্পাদনা করেছেন—নবীন সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রভাত বসু। স্বদেশীযুগ হইতে অদ্যাবধি যে সব কবিতা বাহির হইয়াছে তার শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। **দাম: এক টাকা**

৬। **আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দিবসে কলিকাতায় গুলী বর্ষণ—** আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দিবসে বলদর্পী সাম্রাজ্যবাদ ছাত্রকণ্ঠ-নিসৃত ধ্বনির প্রত্যুত্তর দিয়াছে মৃত্যুবর্ষী আগ্নেয়াস্ত্রের সদর্প হুঙ্কারের মধ্য দিয়া। বালক-কিশোর-তরুণের রক্তে মহানগরীর রাজপথ হইয়াছে রঞ্জিত। তার কাহিনী অঙ্কিত করেছেন—সুনিপুণ সাহিত্যিকদ্বয় শ্রীযুত অজিত বসু মল্লিক ও শ্রীযুত সুকুমার রায়। **দাম: আড়াই টাকা**

৭। **নৌ-বিদ্রোহ**—করাচী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আম্বালা, যশোহর ও জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানের নৌ-সেনাদের বিদ্রোহের সম্পূর্ণ ইতিহাস। সম্পাদনা করেছেন—নৌ-বিদ্রোহী বন্দী নেতা শেখ শাহাদত আলি।
দাম: এক টাকা